কৌতুক কাহিনী

ভূমিকা

কৌতুক-কাহিনীর গল্পগুলি যে সমস্তই স্বকপোল কল্পিত নহে তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। যদিও প্রধানতঃ বালকবালিকাগণের মনস্তুষ্টির জন্যই এ পুস্তক রচিত হইয়াছে তথাপি তাহাদের মাতা পিতারাও ইহা পড়িয়া কিঞ্চিৎ আমোদ উপভোগ করিবেন এরূপ আশা করি।

হে করুণাময়, আমি কার্য্যমাত্রের অধিকারী, ফলাফলের ভার তোমার হাতে। তুমিই তো বলিয়াছ—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।"

ফলে অধিকার নাই কিন্তু ফলকামনা করি; আমার কামনা পূর্ণ করিও। ইতি।

৪ঠা পৌষ,
সন ১৩০৪ সাল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

সূচী-পত্র।

কৌতুক-কাহিনী।

ষণ্ডাসুর।

ষণ্ডাসুর-বধের বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত; শুন বলিতেছি। প্রাচীনকালে সমুদ্রতীরে ত্রিপুর নামক অতি বিখ্যাত এক রাজ্য ছিল; তাহার রাজা পৃথ্বীশ্বরের শিশুপুত্র ভূবিজয় তাহার মাতা অনধীরার সহিত মাতুলালয়ে বাস করিত। মাতা পুত্রের হাত ধরিয়া গৃহের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের উপত্যকাদেশে বেড়াইতে যাইতেন। তাহাকে বন, বনের পশু, ফল, ফুল ইত্যাদি দেখাইতেন—

নির্ঝরিণী ক্ষুদ্রকায়, দুষ্ট বালিকার প্রায়,
আঁধার পর্ব্বত-পথে লাফাইতে যায়;
পা' ঠেকে পাথর 'পরে, হুঁচট খাইয়া পড়ে,
অমনি কল্লোল করি কান্দিয়া ভাসায়।
হরিণীরা কান্না শুনে, ছুটে আসে সেই খানে
সোহাগীর মুখে করে আদরে চুম্বন;
ফুলেরা সে রঙ্গ দেখে, হাসে বৃন্তাসনে থেকে,
পাখীরাও করে তাই কথোপকথন।

কিন্তু অনধীরার আর এক কার্য্য ছিল, তিনি তাহাতে ক্লান্তি-বোধ করিতেন না। তিনি পুত্রের নিকট তাঁহার স্বামীর রূপ, গুণ ও বীরত্বের বর্ণন করিতেন। বালক পিতাকে কখন দেখে নাই; অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার রূপ, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপের কথা শুনিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইত। তাহার মা তাহাকে এক খণ্ড অতি বৃহৎ ও ভারী প্রস্তর দেখাইয়া বলিতেন,—“ভূবিজয়, এই পাথরের নীচে একটা গর্ত্ত আছে, তাহাতে তোমার পিতা তোমার জন্য তাঁহার নিজ হাতের তরবার ও পায়ের পাদুকা রাখিয়া বলিয়া গিয়াছেন. “ভূবিজয় যখন নিজ বাহুবলে এই প্রস্তর তুলিয়া এই তরবার ও পাদুকা ধারণ করিতে পারিবে, তখন আমি তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিব, তৎপূর্ব্বে নয়।” এই বলিয়া অনধীরা পতির কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। বালক মায়ের কথা শুনিয়া পাথর তুলিতে যাইত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুইখানি দ্বারা পাথরের কোণ ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিত; তাহার হাত ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িত, ঘর্ম্মে সমস্ত শরীর ভিজিয়া যাইত, তবু পাথর ছাড়িত না। কিন্তু সে পাথর কি বালকের বলে নড়ে? অনধীরা অবশেষে জোর করিয়া পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যাইতেন।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল। বালক ভূবিজয় পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি কত সহস্রবার যে পাথরখানি তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার প্রবল আকর্ষণে

কখন প্রস্তর নড়িয়াছে, কখনো বা রেখামাত্র সরিয়াছে, কিন্তু উঠে নাই। ভূবিজয় কতদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, গুরুতর শ্রমে তাঁহার মুখে রক্ত উঠিয়াছে, তিনি অচেতনপ্রায় হইয়া ভূতলে পড়িয়া থাকিয়াছেন, আবার উঠিয়া আবার প্রস্তরকে আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু যত্ন সফল হয় নাই। আজ ভূবিজয় মাতার সঙ্গে আসিয়া প্রভাতেই পর্ব্বতোপত্যকায় গেলেন; মাতাকে এক শিলাখণ্ডের উপর বসাইয়া কহিলেন,—

"বয়সে বালক, মাতঃ, নহি আমি আর
তথাপি শিশুর প্রায় দুর্ব্বল, অসার।
আজিও তুলিতে শিলা সক্ষম না হই,
পিতার গ্রহণ-যোগ্য এখনও নই।—
কি লজ্জা, মা, করিয়াছি এই দৃঢ় পণ
আজি কার্য্যসিদ্ধি কিম্বা জীবন-পাতন।"

এই বলিয়া আর কথা না কহিয়া ভূবিজয় গাত্রবস্ত্র সকল ফেলিয়া দিলেন, এবং সেই অতি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের এক কোণ ধরিয়া প্রাণপণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর যাইতে লাগিল, ভূবিজয়ের বিরাম নাই। প্রস্তর খণ্ড পর্ব্বতের কঠিন মাটিতে বসিয়া গিয়া তাহারই এক অংশ-স্বরূপ হইয়া গিয়াছিল; আজ প্রবল শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া নড়িতে লাগিল। বেলা তিন প্রহরের সময় একবার কতক পরিমাণে উঠিল; কিন্তু উঠিয়াই ভীষণ শব্দে পড়িয়া গেল। তখন মাতা পুত্রে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভূবিজয় সগর্ব্বে

কহিলেন—“একবার তুলিয়াছি তো আবার তুলিব।” যে কথা সেই কাজ। যখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়, তখন রাজপুত্র শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া এক বার প্রস্তরখানিকে আকর্ষণ করিলেন। সেই আকর্ষণে প্রস্তরখানা উঠিয়া পড়িল। কি আনন্দ! অনধীরা পুত্রকে দুই বাহুতে বেষ্টন করিয়া তাহার ললাটে শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন, ও আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ভূবিজয় মাতাকে প্রণাম করিয়া গর্ত্ত হইতে পিতার তরবার ও পাদুকা গ্রহণ করিলেন।

'বিশ্বকর্ম্মাকৃত সেই তীক্ষ্ণ তরবার,
কেশগাছি কাটে মুখে পড়িলে তাহার।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত বাট হীরকে খচিত,
অতি মনোহর জ্যোতি দিতেছে নিয়ত।
আর যে পাদুকা, তার বিচিত্র নির্ম্মাণ,
বায়ুতুল্য গতিশক্তি করে সে প্রদান।

তরবার কটিবন্ধে ও পাদুকা পায়ে পরিয়া ভূবিজয় কহিলেন, —“মা, আমি পিতার নিকট যাইব তুমি আমার সঙ্গে যাইবে, চল।” অনধীরা কহিলেন,—“বৎস, আমার যাইবার অনুমতি নাই; তুমি একাকীই যাইবে, কিন্তু এখন নহে। তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আর কিছুকাল আমার নিকটে থাক।” ভূবিজয় স্বীকৃত হইলেন। কিছুকাল অতীত হইলে তিনি আবার মাতার অনুমতি চাহিলেন। মাতা কহিলেন,—“আরো কিছুকাল থাক, তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইবে।” এই-

রূপে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল, অনধীরার 'আর কিছুকাল' আর ফুরায় না। অবশেষে তিনি কুমারের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। বিদায়ের সময় কহিলেন,—

"বীরপুত্র তুমি মম, রাজার কুমার,
বহিবে আপন স্কন্ধে পৃথিবীর ভার।
শত বীর-কার্য্যে সদা রহিবে মগন,
মাতাকে হয়োনা যেন কভু বিস্মরণ।"

ভূবিজয় মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"মা, তোমাকে কখনো ভুলিব না।" তার পর গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

যাইতে যাইতে তিনি এক মহাবনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই বনে প্রধর্ষ নামে এক দুরন্ত দস্যু বাস করিত। সে কোন পথিককে দেখিতে পাইলেই, "আমার গৃহে আসুন, আমি আপনার সেবা করিব" এই বলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া আপনার গৃহে লইয়া যাইত; এবং তথায় তাহাকে এক লোহার খাটে শোয়াইত। যদি তাহার শরীর খাট হইতে খর্ব্ব হইত, তবে হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া উহা খাটের সমান লম্বা করিত, আর যদি উহা খাট হইতে লম্বা হইত, তবে উহা কাটিয়া খাটের সমান করিত—যে রূপেই হউক, অত্যন্ত কষ্ট দিয়া পথিকের প্রাণবধ করিত। প্রধর্ষ এত বলবান্ ছিল যে, কেহই যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিতে পারিত না। তাহার ভয়ে সে বন-পথে লোক প্রায় চলিত না। প্রধর্ষ ভূবিজয়কেও পথ হইতে ডাকিয়া

গৃহে লইয়া গেল ; এবং সেখানে তাঁহাকে সেই লোহার খাটে শুইতে বলিল,—

"বহু পথ চলি ক্লান্ত হয়েছ নিশ্চয়,
শয়নে বিশ্রাম লাভ কর, মহাশয়।"

রাজপুত্র কহিলেন—"আমি ক্লান্ত হই নাই—শুইব না।" প্রধর্ষ তখন নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া "তুমি অবশ্যই শুইবে" বলিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেল। ভূবিজয় তাঁহার তরবারি খুলিলেন, দস্যু তাহার হাতুড়ি লইল। অতি অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর প্রধর্ষ রাজপুত্রের তরবারের আঘাতে দুই খণ্ড হইয়া আপনার সেই খাটের উপর পড়িয়া চির-বিশ্রাম লাভ করিল।

তার পর ভূবিজয় আবার পথে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক পর্ব্বতের গুহায় শৈনক নামক আর এক দুরাচার দস্যু বাস করিত। সে পাপিষ্ঠ অসহায় পথিকগণকে পর্ব্বতের চূড়ায় লইয়া গিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিত। সে ভূবিজয়কেও ধরিয়া লইয়া চলিল। তিনি নিঃশব্দে চলিলেন, প্রথমতঃ কিছুই কহিলেন না ; তার পর পর্ব্বতের চূড়ায় উপস্থিত হইলে নিমেষ মধ্যে শৈনকের হস্ত হইতে আপনার শরীর মোচন করিয়া, তাহাকে ব্যাঘ্রের মুখে মেষ-শিশুর ন্যায় অতি সহজে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। দস্যুর মুখ ও নাক হইতে রক্ত ছুটিতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে ঘুরাইয়া কুমার তাহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শুনিলেন, বসুন্ধরা দেবী কহিতেছেন,—

"শৈনকে বধিয়া আমা' বাঁচালে কুমার,
কষ্টে কতকাল তার বহিয়াছি ভার।
চাহি না তাহার শব বহিতে এখন—
ভালই, সমুদ্র-জলে করেছ ক্ষেপণ।"

এই কথা শেষ হইতেই সমুদ্রের মধ্য হইতে বরুণ দেব কহিলেন,—

"ও দেহ আমার জলে ফেলো না কুমার,
আমি বহিব না ওই পাপিষ্ঠের ভার।"

তখন দুরাত্মা শৈনকের দেহ শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। ভূবিজয় উহাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসিলেন।

এদিকে তাঁহার বীরত্বের কথা দেশে দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। ত্রিপুর রাজ্যের প্রজারা তাহাদের রাজপুত্র আসিতেছেন শুনিয়া মহা আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সকলেরই আনন্দ হইল, কেবল বিষাদ হইল পৃথ্বীশ্বরের ভাগিনেয় অদম্য ও ছোটরাণী সুচিত্রার। পৃথ্বীশ্বর বৃদ্ধ; অদম্য মনে করিয়াছিল যে, তাঁহার পুত্র ভূবিজয় মাতুলালয় হইতে আসিবে না; সে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করিবে। সে এই আশায় পূর্ব্ব হইতেই রাজশক্তি অনেক পরিমাণে নিজের হাতে লইয়াছিল। এখন পথের কাঁটা ভূবিজয় আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া এবং তাঁহার বীরত্বের কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। ছোটরাণী সুচিত্রা মানুষ নয়—রাক্ষসী। মানুষের

রূপ ধরিয়া রাজপুরীতে থাকিত। সে রাজাকে অত্যন্ত বশ করিয়াছিল, যা বলিত, বৃদ্ধ রাজা তাই করিতেন। সে রাত্রিতে হাতীশালা হইতে হাতী ও ঘোড়াশালা হইতে ঘোড়া খাইত। রাজ্যের প্রজা যে কত বিনাশ করিত, তাহার সংখ্যা নাই। কেহ কিছু জানিতে পারিত না। হাতীশালা ও ঘোড়াশালার রক্ষকেরা ও প্রজাগণ রাজার নিকট দুঃখ জানাইতে আসিলে, রাণী তাঁহাকে তাহাদের কথায় কাণ্ দিতে দিতেন না। রাণীর একখানি রথ ছিল, সেখানি জ্বলন্ত অগ্নির দ্বারা নির্ম্মিত; দুইটী পাখাযুক্ত অতি ভয়ানক সর্প উহা শূন্যপথে উড়াইয়া চালাইত। গভীর নিশীথে রাজা ও রাজপুরীর আর সকলে নিদ্রিত হইলে, পাপিষ্ঠা সুচিত্রা তাহার রথে চড়িয়া নানা স্থানে বিচরণ করিত। অনেকে অনেক সময়ে দেখিতে পাইত যে, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ঐ রথ আকাশ পথে শন্ শন্ করিয়া চলিতেছে; কিন্তু উহা কি এবং উহাতে যে সুচিত্রা বিচরণ করিত, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। ছোটরাণী ভূবিজয়ের বল-বিক্রমের কথা শুনিয়াছিল; তাহার প্রাণে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, পাছে তিনি তাহার দুষ্কার্য্য সকল জানিতে পারেন। তাহা হইলে তো আর রক্ষা নাই! সে অদম্যের সহিত চক্রান্ত করিল, যেন ভূবিজয় গৃহে আসিয়া রাজার নিকট আত্ম-পরিচয় দিবার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইতে পারে।

কিছুদিন পরে ভূবিজয় ত্রিপুর নগরে পঁহুছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া দলে দলে প্রজাগণ ও রাজার অমাত্যগণ মহানন্দে তাঁহাকে অভ্যার্থনা করিতে গেল; গায়কেরা গাহিতে

লাগিল, বাদ্যকরেরা বাজাইতে লাগিল, নটীরা নাচিতে লাগিল; সকলে রাজপুত্রের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। রাজা পৃথ্বীশ্বর যেখানে অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, সেখানে কিন্তু কোন সংবাদই পৌঁছায় নাই। ছোটরাণী ও দুষ্ট অদম্য তাঁহাকে কিছুই জানিতে দেয় নাই। অদম্য রাজবাটীর দ্বারদেশে আসিয়া ভূবিজয়কে মৌখিক আদরের সহিত গ্রহণ করিল; আত্ম-পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিল,—

"প্রাণসম প্রিয় তুমি ভাই ভূবিজয়,
আলিঙ্গন করে তোমা' জুড়াল হৃদয়।
আশা-পথ চেয়ে চেয়ে ছিনু এতদিন;
তোমা বিনে এ সাম্রাজ্য জীবন-বিহীন।
বৃদ্ধ জনকের হও সহায় এখন;
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক সর্ব্বক্ষণ।"

ভূবিজয় অদম্যকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া শিষ্টতা প্রকাশ করিলেন। অদম্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজার বাস গৃহের এক কক্ষে বসাইল। কহিল,—"তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি রাজাকে সংবাদ দেই।" তার পর সে যে কক্ষে রাজা ও সুচিত্রা বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে কহিল,—"মহারাজ, যে দুরাত্মা দস্যু আপনার রাজ্যের শত শত প্রজা এবং অশ্বশালার অশ্ব ও হাতীশালার হাতী বিনাশ করিয়াছে, আমরা এতদিন যাহাকে নষ্ট করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইয়াছি, আমি আজ তাহাকে কৌশলে ধরিয়া আনিয়াছি: আমি তাহাকে বলিয়াছি,

"মহারাজ পৃথ্বীশ্বর আপনার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার অভি-প্রায়ে আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। নির্ব্বোধ আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আমার সঙ্গে আসিয়াছে; পার্শ্বের কক্ষে অপেক্ষা করিতেছে। রাণী সুচিত্রার পরামর্শ এই যে, দুর্বৃত্ত এখানে উপস্থিত হইলে তাহাকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দেওয়া যাইবে; তাহা হইলে অতি সহজেই তাহার প্রাণনাশ হইবে। শত্রুবধের জন্য ছলব্যবহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে।" রাজা পৃথ্বীশ্বর রাণী সুচিত্রার খেলার পুতুলের মত ছিলেন। রাণী যাহা বলিত, তিনি তাহাতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। এখনও করিলেন না, কহিলেন,—"আচ্ছা, সুচিত্রা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করা হউক।"

এদিকে কক্ষের ভিতর বসিয়া বসিয়া ভূবিজয় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন। যে পিতার বীরত্ব, কীর্ত্তি ও মহিমা মাতা শত মুখে বর্ণন করিতেন, সেই পিতার সহিত জীবনে আজ প্রথম সাক্ষাৎ হইবে। তিনি কিরূপে পিতাকে সম্ভাষণ করিবেন—তাঁহার পদতলে পড়িবেন, কি তাঁহাকে প্রথমে আলিঙ্গন করিবেন, কিম্বা যে পর্য্যন্ত পিতা সম্ভাষণ না করেন, সে পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন, পিতা তাঁহার হস্তে সেই দিব্য তরবার ও পায়ে সেই পাদুকা দেখিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলে তিনি কি করিবেন—এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় অদম্য আসিয়া তাঁহাকে রাজা ও রাণীর সমক্ষে লইয়া গেল। ভূবিজয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা

যেরূপ বর্ণন করিতেন, তাঁহার পিতা তেমন মহামহিমাময়, তেজোপূর্ণ পুরুষ নহেন—এক জীর্ণ শরীর, দুর্ব্বলচিত্ত বৃদ্ধ। পাপিষ্ঠা সুচিত্রা তাঁহাকে শোষণ করিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার মুখাবয়বে ও চক্ষুতে তাঁহার পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও তেজের চিহ্ন কিছু কিছু বিদ্যমান ছিল। ভূবিজয় পিতার প্রতি সসঙ্কোচে দৃষ্টি করিয়া এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন এবং পিতা কেন কথা বলেন না, বুঝিবা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এই ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইতেছেন, এমন সময় রাক্ষসী সুচিত্রা অত্যন্ত মধুরস্বরে কহিল,—"তুমি পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছ, কিছু খাও, সুস্থির হও, পরে বাক্যালাপ হইবে।" তৎক্ষণাৎ একজন দাসী একখানি সোনার থালে কিছু মিষ্টান্ন ও একটি পাত্রে কিছু শীতল জল আনিয়া দিল, এবং একখানি আসন পাতিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে পৃথ্বীশ্বর একাগ্রচিত্তে ভূবিজয়কে দেখিতেছিলেন, তাঁহার মুখখানি তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছিল, অনির্ণীত কারণে তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে পূর্ণ হইতেছিল; তিনি অতি আগ্রহের সহিত পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কিছুই তাঁহার সুস্পষ্ট মনে হইতেছিল না। এমন সময় ভূবিজয় আহারে বসিবার নিমিত্ত পাদুকা ও কটিবন্ধ হইতে তরবার খুলিলেন; তখন তরবারের স্বর্ণনির্ম্মিত ও হীরকখচিত বাট এবং পূর্ব্ব পরিচিত পাদুকা রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হইল—দৃষ্টি মাত্রে সমস্ত পূর্ব্ব কথা বিদ্যুৎগতিতে তাঁহার মনে পড়িল। তিনি এক লম্ফে আসন পরিত্যাগ করিয়া

ভূবিজয়ের হাত হইতে পাত্র ফেলিয়া দিলেন ও তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন; কহিলেন—"তুমি আমার প্রথমা মহিষী অনধীরার পুত্র ভূবিজয়—হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করিতেছিলাম!" ভূবিজয় গদ গদ স্বরে কহিলেন—"হাঁ, মহারাজ, আমি আপনার পুত্র ভূবিজয়; আমি প্রস্তর উঠাইয়া ভূগর্ভ হইতে আপনার প্রদত্ত তরবার ও পাদুকা লইয়াছি—এই দেখুন।" এই বলিয়া পিতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তিনি তাঁহাকে তরবার ও পাদুকা দেখাইলেন। প্রথম সম্ভাষণের আনন্দ কিছু থামিলে, রাজা চাহিয়া দেখিলেন, সুচিত্রা ও অদমা গৃহে নাই। সুচিত্রা, তাহার দুষ্টাভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল দেখিয়া ও এখন ত্রিপুর রাজ্যে থাকিলে মঙ্গল নাই বুঝিয়া, যখন রাজা ও ভূবিজয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন সেই সময় পলাইয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গিয়াছিল। সে যাইয়াই মায়াবলে আপনার অগ্নির রথ আনাইল এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে চলিয়া গেল; পুরবাসীরা ভীত চক্ষে দেখিল রাজপুরী হইতে এক প্রবল অগ্নিশিখা বাহির হইয়া গেল; তাহার অগ্রে অগ্রে দুই ভয়ঙ্কর সর্প পাখা মেলিয়া উড়িতেছে, তাহাদের গর্জ্জনে সকলের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। অদমাও সময় বুঝিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

এইরূপে দুষ্টা রাক্ষসী ও পাপিষ্ঠ অদম্য দূর হইয়া গেলে বৃদ্ধ রাজা পৃথ্বীশ্বর পুত্র ভূবিজয়ের সাহায্যে যথাবিহিতরূপে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রাজা মুহূর্ত্তের জন্যও কুমারকে ছাড়িয়া

থাকিতে পারেন না। প্রজা ও অমাত্যসকলও তাঁহার প্রতি দিন দিন অধিকতর অনুরক্ত হইলেন।

চারি মাস সুখে কাটিল; তারপর বসন্তকাল আসিল। একদিন রাজপুত্র প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়াছেন, এমন সময় নগরময় ক্রন্দনধ্বনি হইতেছে শুনিতে পাইলেন। সত্বরে বাহিরে আসিয়া ভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা কোন উত্তর না করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে সরিয়া গেল; অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারাও মাথা নামাইয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেন ক্রন্দনের রোল উঠেছে নগরে?
জিজ্ঞাসি, কেহই কেন উত্তর না করে?
সহসা কি অমঙ্গল ঘটিল সবার?
সমস্ত নগরবাসী করে হাহাকার।"

পৃথ্বীশ্বর কহিলেন,—

"এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আর করোনা, তনয়,
মনে হলে হৃদয়ে অশনি-বিদ্ধ হয়।
নীরবেতে সহি, করি অশ্রু বিসর্জ্জন,
ক্ষোভে, অপমানে, পুত্র, সরে না বচন।"

কিন্তু ভূবিজয় ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা কহিলেন,—

"কহ্লন নামাতে দেশ পর্ব্বত মাঝার,
শুন পুত্র, প্রচণ্ড কিরাত রাজা তার।
আমাদের সনে ঘোর করিল সমর,
প্রজানাশ, ধননাশ করিল বিস্তর।
কি কব লজ্জার কথা—হায় অপমান!
সন্ধিভিক্ষা করি শেষে রক্ষা করি প্রাণ।"

শুনিতে শুনিতে ভূবিজয়ের মুখ চোখ লাল হইয়া গেল; তিনি রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। কিছু সুস্থ হইয়া কহিলেন,—"পিতঃ, তার পর?" রাজা কহিলেন—

"দুষ্ট প্রচণ্ডের আমি অধীন এখন,
ভূবিজয়, কর দিয়ে তুষি তার মন।
সাতটী যুবতী আর যুবক সুন্দর—
এই কর দান করি বৎসর বৎসর।"

রাজপুত্র বিস্মিতের স্বরে কহিলেন,—"প্রচণ্ড মানুষ-কর দিয়া কি করে?" রাজা বুকে করাঘাত করিয়া কহিলেন,—

"যণ্ডাসুর নামে এক জীব ভয়ঙ্কর—
যণ্ডের মস্তক তার, নরকলেবর,
সিংহের নখর রাশি, সুতীক্ষ্ণ দশন,
আহ্লাদে মানুষ মাংস করে সে ভোজন।
অতীব গহন এক বনের ভিতরে
প্রচণ্ডের প্রিয় এই জীব বাস করে।

ষণ্ডাসুর

কৌতুক কাহিনী—১৪ পৃষ্ঠা

নরনারী ত্রিপুর হইতে যারা যায়
প্রচণ্ড তাহার মুখে সঁপে সে সবায়।
ইহারি উদর, বৎস, করিতে পূরণ
যুবক যুবতী আমি করি আহরণ।"

শুনিয়া ভূবিজয় বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পৃথ্বীশ্বর অধোমুখে নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন—

"প্রচণ্ডের দূত আজ এসেছে নগরে
যুবক-যুবতী-কর গ্রহণের তরে।
ঘরে ঘরে তাই শুন ক্রন্দনের তান—
কাহার বাছনি লয়ে করিবে প্রস্থান।"

ভূবিজয় পিতাকে কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। যেখানে প্রচণ্ডের দূত রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার সহচরগণ দ্বারা যুবক যুবতী সংগ্রহ করিতেছিল, তিনি সেইখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—

যুবক, দূত, কর সংগ্রহণ,
আমি কহ্লনেতে যাব—আমি এক জন।"

দূত রাজপুত্রকে চিনিত না, কিন্তু তাঁর সুন্দর কান্তি দেখিয়া বুঝিল, তিনি সামান্য যুবক নহেন। সে বিস্মিত হইয়া কহিল,—

"কহ্লনে যাইবে, যুবা? জান কি কারণ?
কাজ কি কহ্লনে?—গৃহে করহ গমন।"

রাজপুত্র সগর্ব্বে কহিলেন,—

"জানি, দূত, কেন সবে কহ্লনেতে যায়,
জানিয়া যাইতে আমি এসেছি স্বেচ্ছায়।
সুধু ছয় জন যুবা কর আহরণ,
আমি আছি—বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন।"

দূত সে কথা শুনিল না। ভূবিজয়ের বীরত্ব ও মহত্ত্ব এবং তাঁহার রাজশ্রী দেখিয়া এবং কহ্লনে গেলে তাঁহার কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার হৃদয় ভক্তি, স্নেহ ও দুঃখে পূর্ণ হইল। সে ব্যাকুলভাবে বার বার কুমারকে অনুরোধ করিতে লাগিল—তিনি তাঁহাব বিষম সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। সে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, ষণ্ডাসুরের বিকট মূর্ত্তি ও ভয়ঙ্কর শক্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে ভীত করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা বিফল হইল। এদিকে রাজা যখন শুনিলেন, রাজকুমার নিজে কহ্লনে যাইতেছেন, তখন তিনি পাগলের ন্যায় রাজপুরী হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কহিলেন,—

"তুমি রাজ্য অধিকারী, রাজার নন্দন,
তুমি বিনা রাজ্যভার কে করে বহন?
তুমি এক পুত্র মম, তুমিই সম্বল,
তুমি গেলে আমার থাকিয়া কিবা ফল?"

উপস্থিত অমাত্যেরা কহিলেন,—

"তুমি বুঝি বিনিময়ে জীবন তোমার
একটী প্রজার প্রাণ চাহ রক্ষিবার?

বরং কুমার, তব রক্ষিতে জীবন
শত শত প্রজা প্রাণ করিবে অর্পণ।"

প্রজাগণ দ্রবীভূত হইয়া কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে করিতে কহিল,—

"আমাদের পুত্রকন্যা পাঠাইব আজ
দীর্ঘজীবি হয়ে সুখে রহ, যুবরাজ।"

ভূবিজয় স্থিরভাবে পিতাকে কহিলেন,—

"আপনার আশীর্ব্বাদে, পিতা মহাশয়,
ষণ্ডাসুরে বধ আমি করিব নিশ্চয়;
যুবকযুবতীগণে করিব উদ্ধার,
নিবারিব চিরতরে আশঙ্কা প্রজার।
আমি মেষ শিশু নহি, আমাকে অসুর
অনায়াসে দন্তাঘাতে করিবে না চূর।
নির্ভয়ে থাকুন, পিতঃ, এই বাহুবলে
ষণ্ডাসুরে বধি গৃহে আনিব সকলে।"

অমাত্যগণকে কহিলেন,—

"কি কথা কহিলা সবে, হে অমাত্যগণ!
শত প্রজা নাশ করি বাঁচাব জীবন?
বরং করিব আমি শত প্রাণ দান
একটী প্রজার ক্ষুদ্র বাঁচাইতে প্রাণ;—
রাজার কর্ত্তব্য প্রজারক্ষণ, পালন,
নহে প্রজানাশে নিজ জীবনরক্ষণ।"

প্রজাগণকে কহিলেন,—

"ভাবনা করোনা, সবে ত্যজ হাহাকার,
তোমাদের পুত্রকন্যা করিব উদ্ধার।
ষণ্ডাসুরে বধি গৃহে ফিরিব যখন
দীর্ঘজীবি হয়ে সুখে রহিব তখন।"

ইতি মধ্যে কহ্লনদূতের সহচরগণ ছয়টী যুবক ও সাতটী যুবতী লইয়া আসিল; তাহাদের পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গে আসিল, নগরের সমস্ত লোক সেখানে একত্রিত হইল। তখন ক্রন্দনের মহারোল উঠিল,—

কোন বা শোকার্ত্ত পিতা করে হায় হায়,
কোন মাতা অচেতনে ভূমিতে লুটায়।
কেহ পুত্র কোলে লয়ে করে পলায়ন,
ধরিয়া ফিরায়ে তারে আনে দূতগণ।
অঞ্চলে লুকায়ে কন্যা কোন মাতা কয়,
'আমাকে লইয়া যাও, দূত মহাশয়।'
ভগিনীর কণ্ঠে পড়ি পাগলের প্রায়
কোন হতভাগ্য ভ্রাতা কাঁদিয়া ভাসায়।
কেহ বলে 'যুদ্ধে কেন হলো না মরণ?
হা বিধি, মেষের মত হারাব জীবন।'
প্রেমিক প্রেমিকাস্থানে বিদায় লইয়া
'কি হল!' বলিয়া ভূমে পড়ে আছড়িয়া।

সেই উচ্ছলিত শোক-সাগরে স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া

একমাত্র রাজকুমার ভূবিজয়। তিনি তাঁহার সেই পাদুকা পরিয়া ও কটিতে সেই তরবার বান্ধিয়া অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

সকল কার্য্যেরই শেষ আছে; ক্রন্দন ও বিদায়গ্রহণেরও শেষ হইল। দূতগণ যুবকযুবতীগণকে লইয়া নগর হইতে যাত্রা করিল।

কহ্লন নগরে পেঁাছিয়া দূতেরা যুবকযুবতীগণকে রাজসভায় রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা প্রচণ্ডের অত্যন্ত কর্কশ মূর্ত্তি; শরীর প্রকাণ্ড, বর্ণ কাল ও চক্ষু রক্তবর্ণ—দেখিয়া ভয় হয়। অমাত্যগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়া যে যাহার কার্য্য করিতেছে, আর তাঁহার পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা অরুণা সিংহাসনের একটু অন্তরে বসিয়া আছেন। প্রধান দূত কহিল,—"মহারাজ, ত্রিপুর নগর হইতে এই সাতটী যুবক ও সাতটী যুবতী লইয়া আসিয়াছি।" প্রচণ্ড এক বার মাত্র হতভাগ্য ও হতভাগিনীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন, অমনি রাজকুমার ভূবিজয়ের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল; আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না! তাঁহার উন্নত মূর্ত্তি, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, পরম সুন্দর মুখাবয়ব এবং বিশাল বক্ষ দেখিয়া তিনি সহজেই বুঝিলেন, যুবক উচ্চ বংশে জন্মিয়াছে। দূতের প্রতি দৃষ্টি করায় দূত প্রচণ্ডের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া করযোড়ে কহিল,—"মহরাজ, এই যুবক ত্রিপুররাজ পৃথ্বীশ্বরের পুত্র, যুবরাজ ভূবিজয়। ইনি রাজা ও রাজ্যের সকলের নিষেধ সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন।" এই কথা বলিবামাত্র অমাত্য-

গণ ও রাজকন্যা অরুণা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভূবিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল, তাঁহারা রাজপুত্রের জন্য দয়া ভিক্ষা করিতেছেন। বুঝিয়া প্রচণ্ড কোমল ভাবে কহিলেন,—

"পিতার পাপের হেতু ক্ষমা চাহিবারে
বুঝিবা আসিলা হেথা কহ্লন নগরে;
কিম্বা প্রাণ দিয়া তার পাপ বিমোচন
করিবারে, ভূবিজয়, করেছ মনন?
তাই যদি হয়, আমি প্রসন্ন তোমায়;
তোমাকে বিনাশ করি নাহি মন চায়।
ছয়টী যুবকে তুষ্ট রহিব এবার,
তুমি গৃহে ফিরে যাও, রাজার কুমার।"

শুনিয়া অরুণার চক্ষুদ্বয় আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভূবিজয় কহিলেন,—

"ক্ষমা চাহিবারে মম নহে আগমন,
পাপ বিমোচন করি নহে এ মনন;
কোন পাপে পাপী পিতা নহেন আমার,
কিবা প্রায়শ্চিত্ত কিবা ক্ষমাভিক্ষা তার?
প্রাণভিক্ষা দিয়ে দয়া দেখালে আমায়;
চাহি না; ভিক্ষার তরে আসিনি হেথায়।
কেন আসিয়াছি শোন,—দেহ মোরে রণ
তুমি একা, কিম্বা ইচ্ছা কর যত জন।

অথবা দেখাও মোরে কোথা ষণ্ডাসুর
ত্রিপুরের ত্রাস আমি করিব বিদূর।"

এই সব কথা কহিতে কহিতে ভূবিজয়ের মুখ চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি হাতের তরবার দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া উহা কোষ হইতে অর্দ্ধেক নিষ্কোষিত করিলেন। রাজকন্যা অরুণা তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মনে মনে কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—

"শিবা শিশু, এত বল তোমার হৃদয়ে
সিংহে পদাঘাত কর সিংহের আলয়ে?"

তখন কোটালকে আজ্ঞা দিলেন,—

"এ বাচালে কারাগারে নিয়ে যা এখন,
লোহার শিকলে দৃঢ় করিবি বন্ধন;
আর সকলের আগে প্রভাতেই কাল
ষণ্ডের মুখেতে এরে ফেলিবি কোটাল।"

তখন অরুণা পিতার পদতলে লুটাইয়া কহিলেন,—

"ক্ষমা কর, পিতঃ, ক্ষমা কর যুবরাজে,
কুমারের হেন মৃত্যু কখনো কি সাজে?"

প্রচণ্ড কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া কহিলেন,—

"অন্তঃপুরে যা, অরুণা, এসব কথায়
কোন কথা কহা তোর শোভা নাহি পায়।"

অরুণা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

গভীর রাত্রিতে আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল এবং রাজপুরীতে সকলে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, তখন ভূবিজয়ের কারাগারের দরজা খুলিয়া অরুণা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অরুণা কহিলেন,—"রাজপুত্র, আমি তোমাকে মুক্ত করিব, আমার সঙ্গে আইস।" রাজপুত্র কহিলেন,—"আমি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না; ষণ্ডাসুরকে বধ না করিয়া ও আমার সঙ্গী ও সঙ্গীগণকে না লইয়া কহ্লন হইতে যাইব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।" অরুণা বড় কাতর হইলেন; বুঝাইলেন,—ষণ্ডাসুর ভয়ানক জীব, লোকে তাহার আকৃতি দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়; তাহার গর্জ্জন শুনিলে প্রাণ কাঁপে; আমি শুনিয়াছি, তাহার শরীরে শত সিংহের বল; তুমি একা তাহাকে কিরূপে বধ করিবে?" ভূবিজয় কহিলেন, রাজপুত্রি, একা বলিয়া ভয় করি না; কিন্তু আমি যে নিরস্ত্র; কারারক্ষকেরা তোমার পিতার আজ্ঞায় আমার তরবার ঢাল ইত্যাদি লইয়া গিয়াছে; কিন্তু ষণ্ডাসুর যেখানে থাকে, সেখানে কি গাছের ডাল নাই, বড় বড় পাথর নাই?" অরুণা কহিলেন,—"তুমি যদি নিশ্চিতই ষণ্ডাসুরকে বধ করিতে যাইবে, তোমাকে নিরস্ত্র যাইতে হইবে না; আমি তোমার তরবার, পাদুকা ও ঢাল আনিয়াছি, এই লও।" এই বলিয়া তাঁহার দিব্য তরবার, ঢাল ও পাদুকা তাঁহাকে দিলেন। ভূবিজয় আহ্লাদে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন,—"রাজকুমারি, তুমি আজ আমার যে——।" অরুণা বাধা দিয়া কহিলেন,—"এখনও কোন উপকার করিয়াছি

বলিতে পারি না। তুমি অবিলম্বে আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে ষণ্ডাসুরের বনে লইয়া যাইতেছি ; যদি রাত্রি মধ্যেই ষণ্ডাসুরকে বধ করিতে পার, তবে প্রভাতের পূর্ব্বেই কহ্লন ত্যাগ করিতে পারিবে।” যুবরাজ কহিলেন,—“রাজপুত্রি, তুমি কিরূপে কারাগারে প্রবেশ করিলে এবং কোথাইবা আমার অস্ত্রাদি পাইলে ?” অরুণা আপনার অলঙ্কারশূন্য দেহ দেখাইয়া কহিলেন,—“আমার হার, বালা, বাজু ইত্যাদি সমস্ত অলঙ্কার কারারক্ষক-গণকে দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছি। তাহারা আমাকে তোমার অস্ত্রাদি দিয়াছে ও কারাগারে প্রবেশ করিতে দিয়াছে।” শুনিয়া ভূবিজয় কথা কহিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন।

ক্ষণকাল পরে অরুণা কহিলেন,—‘আইস !’ রাজকুমার অরুণার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নগরেব বাহিরে এক মহাবিস্তৃত বন ; চন্দ্রালোকে যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর বন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। অতি দূরে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইতেছিল। অরুণা কহিলেন,—“এই বন ; ইহার ঠিক মধ্যস্থলে ষণ্ডাসুর বাস করে। ঐ শুন, তাহার গর্জ্জন কিছু কিছু শোনা যাইতেছে। অসুর রাত্রিতেও নিদ্রা যায় না। এই বন অত্যন্ত নিবিড়, ইহার ভিতরে এক বার প্রবেশ করিলে দিক্‌ভ্রম হয়—সহজে বাহির হইতে পারা যায় না।” ভূবিজয় কহিলেন,—“তার জন্য ভাবনা নাই ; যদি অসুরকে বধ করিতে পারি, তবে বন আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না ; বন কাটিয়া রাস্তা করিব।”

অরুণা কহিলেন,—"আমি বাহির হইবার এক উপায় করিয়াছি, আমি এই রশির গুচ্ছ আনিয়াছি, ইহাতে অত্যন্ত দীর্ঘ রশি আছে; আমি ইহার এক মাথা ধরিয়া এইখানে বনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিব, তুমি বাঁ হাতে রশি ছাড়িতে ছাড়িতে যাও। বনের মধ্য স্থলে যণ্ডাসুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে গুচ্ছ রাখিয়া দিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিও। যুদ্ধ শেষ হইলে তুমি রশি ধরিয়া টানিও, তাহা হইলে আমি বুঝিব, তুমি জয়লাভ করিয়াছ এবং জীবিত আছ; তুমিও রশি ধরিয়া সহজে বন হইতে বাহির হইতে পারিবে।" রাজকুমার কহিলেন,—"উত্তম, আমার হাতে গুচ্ছ দাও।" তার-পর তিনি অরুণার প্রেমময় মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নীরবে বিদায় লইলেন; তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন স্পষ্টই বলিল,—

"যদি বেঁচে থাকি, দেখা হইবে আবার
নতুবা এ সর্ব্বশেষ বিদায় আমার।"

অরুণা কথা কহিলেন না। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। কিন্তু ভূবিজয় বুঝিলেন, তিনি যেন বলিতেছেন,—

"বেঁচে যদি ফিরে আস রাখিব জীবন,
নতুবা তোমারি পথে আমারো গমন।"

রাজপুত্র বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পায়ে সেই পাদুকা, হাতে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত সেই তীক্ষ্ণ অসি, বক্ষে ঢাল এবং বাম হস্তে রশির গুচ্ছ। তিনি রশি ছাড়িতে ছাড়িতে চলিলেন। সে অতি গভীর বন—

বড় বড় বৃক্ষ সব দাঁড়ায়ে তাহায়
লতা-গুল্ম বিজড়িত, আকাশ মাথায় ;
পশিয়াছে বনতলে অল্প চন্দ্রকর,
আঁধার চিত্রিত তাহে হয়েছে সুন্দর।
ষণ্ডের প্রতাপে বনে যত পশুগণ,
মিত্র ভাবে করে সবে জীবন যাপন।
সিংহ, ব্যাঘ্র, করী, শশ, হরিণ সকলে,
একত্রে লুকায় ভয়ে কাননের তলে।
বৃক্ষে যে পাখীরা রহে তারাও যেমন,
অসুরের ভয়ে সদা মহাভীত মন।
বীর ভূবিজয়ে দেখি বনের ভিতর,
পশুপক্ষিগণ যেন বিস্মিত অন্তর ;
বৃক্ষশাখে, বনতলে মহা কলরব,
কুমার শুনিলা যেন কহে তারা সব—
'কোথা যাও, কোথা যাও, যেওনা কুমার,
পড়িলে ষণ্ডের হাতে নাহিক নিস্তার।"

কিন্তু রাজপুত্র অদম্য সাহসে চলিলেন। পশুপক্ষিগণের ভয়ানক চীৎকারে কুপিত হইয়া, বোধ হয় ষণ্ডাসুর আজ অত্যন্ত আস্ফালন করিতেছিল। ভূবিজয় তাহার আবাস স্থলে উপনীত হইলে, সে প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। ক্ষণকাল পরে যখন তাঁহার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল, তখন সে এমন ভয়ঙ্কর নাদ করিল যে, সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল, কুলায় হইতে

অনেকগুলি পক্ষীশাবক পড়িয়া গেল, পক্ষীগুলি আকাশে উড়িয়া ত্রাসে কোলাহল করিতে লাগিল, বনের পশু বন পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ের দিকে ছুটিল ; কুমারের হাতের তরবারি চন্দ্র-কিরণে ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, মাটিতে পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। তিনি চকিতবৎ তরবার তুলিয়া দৃঢ়রূপে ধরিলেন। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, ষণ্ডাসুরের আকৃতি অর্দ্ধেক মানুষের মত ও অর্দ্ধেক্ ষাঁড়ের মত ; সে ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করিয়া ভূবিজয়কে কহিল,—

"একগ্রাসে খাই তোরে তুই ক্ষুদ্র নর !"

ভূবিজয় এক বৃক্ষে পিঠ রাখিয়া তরবার সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন,—

"আয় জন্মশোধ তোরে খা(ও)য়াই, পামর।"

তখন ষণ্ড মাথা নামাইয়া অতি ভীষণবেগে রাজপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। তিনি বিদ্যুৎবেগে সরিয়া যাইয়া পশ্চাৎ হইতে অসুরকে অতি ভয়ঙ্কর আঘাত করিলেন। অসুরের শৃঙ্গের আঘাতে মহাবৃক্ষ দুইখণ্ড হইয়া ঘোর রবে পড়িয়া গেল, সেও দিব্য তরবারের আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল। জীবনে সে কখনও আঘাত পায় নাই—এই প্রথম। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধের কি আর বর্ণনা করিব ? যুবরাজের পায়ে যে পাদুকা ছিল, তাহার গুণে তিনি অসুরের এই সম্মুখে, এই পার্শ্বে, এই পশ্চাতে, এই উপরে, এই নীচে, বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন ; তাঁহার বিশ্বকর্ম্মা-

নির্ম্মিত দিব্য তরবার অসুরের যে অঙ্গে পড়িতে লাগিল, সেই অঙ্গই একেবারে দুই খণ্ড হইতে লাগিল। দুই জনের পদভরে ভূমিকম্প হইতে লাগিল। ষণ্ডের ভীষণ গর্জ্জনে ও কাতর চীৎকারে বন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বনপ্রান্তে অরুণা দাঁড়াইয়াছিলেন, অবশাঙ্গে বসিয়া পড়িলেন। কহ্লনবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, তাহারা ভূমিকম্প ও সঙ্গে সঙ্গে মেঘ-গর্জ্জন হইতেছে মনে করিয়া ভীত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে ষণ্ডাসুর রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছিল, দুই চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল, এবং সমস্ত শরীরের গভীর ক্ষত সকল হইতে বন্যার স্রোতের ন্যায় রক্ত পড়িয়া বনভূমি প্লাবিত হইতেছিল। রাজকুমার তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং নিমেষ মধ্যে তাহার স্কন্ধ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার শরীর ও মস্তকের আঘাতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভূপতিত হইল।

এইরূপে ষণ্ডাসুর নিপাত হইলে, ভূবিজয় তরবার ভূমিতলে রাখিয়া অরুণা যে রশি দিয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া কয়েকবার সজোরে আকর্ষণ করিলেন; পরে একটী ভূপাতিত বৃক্ষের উপর বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিলেন।

যখন বনপ্রান্তে অরুণার সহিত ভূবিজয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন-কার যে আনন্দ তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই, তোমরা মনে মনে বুঝিয়া লও। সে আনন্দের উচ্ছাস কিছু কমিলে অরুণা কহিলেন,—"রাজপুত্র, আমরা বৃথা গৌণ করিতেছি; রাত্রি

অধিক নাই, তুমি সত্বর কহ্লন ত্যাগ কর।” ভূবিজয় কহিলেন,—“আমি একাকী যাইব না।” অরুণা কহিলেন,—“আমি একাকী যাওয়ার কথা কহিতেছি না, তোমার সঙ্গের যুবকযুবতীদেরও লইয়া যাও।” ভূবিজয় গদ গদ স্বরে কহিলেন,—“আর তুমি, রাজকুমারি? আমি তোমাকে কি প্রকারে ফেলিয়া যাইব? প্রভাতে তোমার পিতা যখন তোমার কার্য্য জানিতে পারিবেন, তখন তোমার কি আর রক্ষা থাকিবে?

দয়া করি সঙ্গে যদি আইস, কুমারি,
তোমাকে ত্রিপুর রাজ্যে নিয়ে যেতে পারি।
আমার বামেতে বসি প্রভায় বিমল,
ত্রিপুরের সিংহাসন করিবে উজ্জ্বল।”

অরুণা সুন্দরী লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে মৃদুস্বরে কহিলেন,—

“বড় সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু হে কুমার,
আমি একমাত্র কন্যা আমার পিতার।
আমি গেলে কে তাঁহার করিবে যতন,
রোগে তাপে কে তাঁহার করিবে সেবন?
তুমি এবে গৃহে যাও, হয়ো না মলিন;
ভাগ্যে থাকে একত্রে মিলিব কোন দিন।”

অরুণা আরো কহিলেন,—

“আমি আদরের কন্যা আমার পিতার,
পিতা হ’তে কোন ভয় নাহিক আমার।

ভূবিজয় ও অরুণা।

কৌতুক-কাহিনী—২৮ পৃষ্ঠা।

কোটী অপরাধ মম হইবে মার্জ্জন,
করোনা আমার হেতু ভয় অকারণ।"

কাজেই বাধ্য হইয়া ভূবিজয়ের অরুণাকে ফেলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তোমরা শুনিয়া বড়ই সুখী হইবে যে, তিনি ত্রিপুর নগরে পঁহুছিবার বৎসরেককাল মধ্যে অরুণা ও তাঁহার নিজের যত্নে কহ্লন ও ত্রিপুর রাজ্যমধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। প্রচণ্ড ও পৃথীশ্বর পরস্পরকে মিত্র ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আর কি হইল? ভূবিজয়ের সহিত অরুণার মহা সমারোহে বিবাহ হইল। তারপর দুই বৃদ্ধ রাজা শেষ অবস্থায় সিংহাসন ত্যাগ করিলে, ভূবিজয় দুই রাজ্যের এক রাজা হইয়া অরুণাকে আপনার বামে সিংহাসনে বসাইয়া পরম সুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তোমরা সকলে অরুণা-ভূবিজয়ের জয় গান কর।

ত্রিশির দানব।

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারস্থিত লোহিত্য রাজ্যের রাজা লীলাবতু ও তাঁহার প্রজাগণ বড় বিপদাপন্ন; কেননা ত্রিশির নামক এক অতি ভয়ঙ্কর জীব রাজ্য মধ্যে মহা উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। ত্রিশির কেমন জান?—

এক ভয়ঙ্কর সিংহ, এক অজগর,
একটী ছাগের সনে যুক্ত কলেবর।
ভিন্ন ভিন্ন শির, পুচ্ছ, চরণ সকল,
তিন মুখে ভিন্ন ভিন্ন করে কোলাহল;—
সিংহ মুখে গর্জ্জে যবে, ভূমিকম্প হয়,
সর্পের গর্জ্জন যেন ঝঞ্ঝাবাত বয়,
ভ্যা ভ্যা শব্দে মহা ছাগ করিলে চীৎকার
পর্ব্বতে, প্রান্তরে নাদে প্রতিধ্বনি তার।
তিন নাসা হতে সদা অতি ভয়ঙ্কর
অগ্নিশিখা বাহিরিয়া দহে চরাচর;
পদাঘাতে চূর্ণ হয় শিলা সমুদয়;
দেহ ভারে ধরা বুঝি রসাতলে যায়।

এই জীব হিমালয়ের অভ্যন্তরে বাস করিত, এবং সদাসর্ব্বদা

ত্রিশির দানব।

কৌতুক-কাহিনী—৩০ পৃষ্ঠা।

আবাস স্থান হইতে বাহির হইয়া লোহিত্য রাজ্যের গ্রাম ও নগর সকল উচ্ছন্ন করিত। একবারে শত শত মনুষ্য ও পশু গলাধঃকরণ করিত, শত শত গৃহ নাসিকার অগ্নিতে দগ্ধ করিত; কখনো বা শস্যক্ষেত্র সকলের মধ্যে পড়িয়া ছাগমুণ্ড দ্বারা একেবারে শত শত ক্ষেত্রের শস্য উদরসাৎ করিত। লীলাবত্নু প্রথমে ইহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ ও সেণাপতিগণ সকলেই ত্রিশিরের উদর মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আপন রাজ্য হইতে পঁচিশ জন মনুষ্য, একশত পশু এবং শত মণ শস্য তাহাকে ডালি পাঠাইতেন। ইহা পাইয়া সে আর রাজ্য মধ্যে উৎপাত করিত না। এইরূপে কয়েক মাস গেল; কিন্তু রাজ্য শূন্য হইতে লাগিল। প্রজাগণ রাজাকে অভিসম্পাত করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। প্রজাগণ কহিত,—

"রাজার উচিত কার্য্য প্রজাসংরক্ষণ;
লীলাবত্নু বিপরীত করে আচরণ।
প্রজাগণে বলি দিয়া আপনা বাঁচায়
এমন পাপের রাজ্যে কভু থাকা যায়?"

রাজকন্যা সুদক্ষিণা এই সব কারণে অতি ব্যথিতা হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক, তাঁহার সাধ্য কি? তিনি সর্ব্বদা পিতার নিকট কেবল বিলাপ করিতেন।

এদিকে তাঁহার স্বয়ম্বর উপস্থিত। তিনি অত্যন্ত রূপবতী

ও গুণবতী ছিলেন। তাঁহার রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে রাজপুত্রগণ স্বয়ম্বরকালে লীলাবতুর রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ইহা ব্যতীত দর্শক, ভিক্ষুক, গায়ক, বাদক, ক্রীড়াপ্রদর্শক প্রভৃতি বহু সহস্র লোক সমবেত হইল। স্বয়ম্বর দিনে চতুর্দ্দিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং এত দুর্দ্দশার অবস্থাতেও রাজ্য মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। প্রজাগণ যদিও রাজার ব্যবহারে বিরক্ত, তথাপি রাজকুমারী সুদক্ষিণাকে মনে প্রাণে ভাল বাসিত। বিবাহপ্রার্থী রাজকুমারগণ সভাস্থ হইলে যথা সময়ে সহচরীগণ বেষ্টিতা হইয়া সুদক্ষিণা সভাগৃহে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার—

হস্তে দধি পাত্র নাই, নাহি পুষ্পহার,
দেহে নাই রাজোচিত বস্ত্র অলঙ্কার।
বিষাদে মলিনমুখী, আনত নয়ন
নিশা শেষে শশিকলা মলিনা যেমন।

রাজকুমারী রাজপুত্রগণের মধ্যে না যাইয়া পিতার সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; তাহাতে সভাস্থ সকলে চমৎকৃত ও দুঃখিত হইল। লীলাবতু কন্যাকে কহিলেন,—

"একি, মা, এ বেশ কেন কোথা আভরণ?
বিষাদকালিমামাখা কেন, মা, বদন?"

সভাস্থগণ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজপুত্রি, আপনি কি স্বয়ম্বরা হইবেন না?" সুদক্ষিণা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরিশেষে মৃদুস্বরে প্রধানা সহচরীকে কহিলেন,—

"সখি, রাজপুত্রগণে কর নিবেদন,
দেবতা সাক্ষাৎ আমি করিয়াছি পণ—
যিনি করিবেন দুষ্ট ত্রিশিরে সংহার
এ দাসী চরণযুগ সেবিবে তাঁহার।
সোণার লোহিত্য রাজ্য যায় রসাতলে,
দুঃখের সাগরে ডু'বে রয়েছি সকলে।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বামী প্রেমময়,
শোকে হাহাকার করে—বিদরে হৃদয়।
কেমনে বিবাহ হবে এমন দশায়?
এ দুঃখ থাকিতে হর্ষ সাজে না আমায়।
বীরগণে কহ, সখি, এই অনুনয়—
'এ অধীনা বরণীয়া যদি মনে হয়,
তবে লোহিত্যের অরি করিয়া সংহার
ধরাময় যশোরাশি করুণ বিস্তার'।"

বেত্রবতী সুদক্ষিণার কথাগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিল। তাঁহার বিনয়নম্র কথাগুলি শুনিয়া ও সুদক্ষিণার মাধুর্য্যময় সকরুণ বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমাগত বীরগণের হৃদয়ে, সহানুভূতি, জ্বলন্ত উৎসাহ, যশোলাভের প্রবল ইচ্ছা এবং অতি গভীর প্রেমের উদ্রেক হইল। তাঁহাদের মধ্যে এক জন—তাঁহার নাম বীরেন্দ্রনারায়ণ—তিনি উঠিয়া লীলাবতুকে কহিলেন—

"রাজন্, স্বগণ সহ আমরা সকলে,
একে একে ত্রিশিরে ভেটিব রণস্থলে।

সভা ভঙ্গে অনুমতি করুন প্রদান,
অদ্যই সাধিতে কার্য্য করিব প্রস্থান।”

রাজাজ্ঞায় সভা ভঙ্গ হইলে, রাজপুত্রগণ আপন আপন নিরূপিত গৃহে গমন করিলেন এবং ত্রিশিরের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জয়ন্তীপুরের রাজপুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সুদক্ষিণার রূপে ও গুণে বিমোহিত হইয়াছিলেন; স্বয়ম্বর সভায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ত্রিশিরকে বধ করিয়া এই লাবণ্যবতী রমণীকে বিবাহ করিব, না হয় ত্রিশিরের হস্তে প্রাণপাত করিব। পাছে অন্য কেহ পূর্ব্বেই দানবকে হত্যা করে, এই জন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে সুসজ্জিত হইয়া হিমালয়াভিমুখে চলিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি অনুচরের দ্বারা সুদক্ষিণার হস্তে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

“রাজপুত্রি, জয়ন্তির নৃপতি নন্দন,
লিপিযোগে করে তোমা’ প্রীতিসম্ভাষণ।
রূপে গুণে মোহিয়াছ হৃদয় আমার,
তোমাকে না পাই যদি, অসার সংসার।
এখনি চলিনু আমি ত্রিশির সমরে
বিলম্ব না সহে—মন ধৈর্য্য নাহি ধরে।
হরের কৃপায় অরি করিব নিধন,
অথবা তোমারি কার্য্যে ত্যজিব জীবন।
যুদ্ধ হতে ফিরে যদি না আসি জীবনে,
তাই হৃদয়ের বার্ত্তা কহিনু, ললনে।”

সুদক্ষিণা পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"রূপগর্ব্বে করি নাই, হে রাজকুমার,
এমন কঠিন পণ—ত্রিশির-সংহার।
আমিতো সামান্যা, তুচ্ছা; অপ্সরানিচয়
তোমাদের চরণের দাসীযোগ্যা নয়।
বিনীতার অপরাধ করোনা গ্রহণ,
রাজ্যের কল্যাণ হেতু করিয়াছি পণ।
ত্রিশির অমর নহে, নৃপতি তনয়,
কে জানে তোমারি হস্তে তার মৃত্যু নয়?
একান্তে করিব আমি হর আরাধন,
তোমার বাসনা তিনি করুন পূরণ।"

বীরেন্দ্রনারায়ণ পথে বাহির হইলেন। তিন চারি দিন অনবরত চলিয়া, তিনি এক অপ্রশস্ত উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। সেই উপত্যকায় ত্রিশির বাস করিত। তিনি দেখিলেন, ঐ স্থানে বৃক্ষ-লতা সকল পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া আছে এবং চারিদিকে রাশি রাশি অস্থি পড়িয়া আছে। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত কোন জীব জন্তু বাস করে না; ত্রিশিরের নিশ্বাসে এবং মৃতদেহ সকলের দুর্গন্ধে আকাশের বায়ু বিষাক্ত। সে উপত্যকায় সূর্য্যকিরণও বুঝি প্রবেশ করে না। কুজ্ঝটিকায় দুপ্রহর বেলাতেও সে স্থান অন্ধকার; বীরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া, মনে মনে আপন ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। পরে ধনুতে টঙ্কার দিয়া সিংহনাদ করিলেন; তাঁহার সহচরগণ তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। কিছুকাল পরে—

পদতলে কাঁপে ধরা মেঘনাদ হয়,
সর্পের বিষাক্ত শ্বাসে ঝঞ্ঝাবাত বয় ;
পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গি চূর্ণ হয়ে পড়ে,
দাবানল সম অগ্নি জ্বলিল সত্বরে ;
ভয়ে নির্ঝরিণীগণ আঁধারে লুকায়,
পর্ব্বতের পাদদেশে পলাইয়া যায়।

ত্রিশির এক লম্ফে বীরেন্দ্র ও তাঁহার সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলে, তাঁহারা তাহার প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে তার গতি রোধ হইল না ; সে সৈন্যগণের উপরে পড়িয়া, তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল এবং অনেকগুলিকে গ্রাস করিল। বীরেন্দ্র লম্ফ দিয়া দানবকে অসি হস্তে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করিলেন। সে যাতনায় ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাকে কখনো নখর, কখনো দন্ত, কখনো বা পুচ্ছ দ্বারা বজ্রতুল্য তেজে আঘাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বীরেন্দ্র বিদ্যুৎতুল্য বেগে কখনো সম্মুখ কখনো পার্শ্ব, কখনো বা পশ্চাৎ হইতে তাহাকে অবিরত আঘাত করিতে লাগিলেন ; রক্তের নদী বহিল। কিন্তু অদৃষ্টের গতি কে রোধ করিতে পারে ? যুদ্ধ করিতে করিতে রাজপুত্র উপত্যকা মধ্যস্থিত এক অতি বেগবতী নির্ঝরিণীর তীরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্পের পুচ্ছের বিষম আঘাতে বহু নিম্নে সেই নির্ঝরিণী মধ্যে পড়িয়া, চৈতন্যশূন্য অবস্থায় ভাসিয়া চলিলেন।

যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন, তিনি এক পর্ব-

কুটীরে অবস্থিতি করিতেছেন ; তাঁহার চারি পার্শ্বে পরম সুন্দর ঋষিপুত্রগণ বসিয়া সম্মুখস্থ অগ্নিতে তাঁহার হস্তপদসেক করিতেছেন ও তাঁহার ক্ষত সকলে ঔষধ লেপন করিতেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বেশ সুস্থ বোধ করিলেন, এবং উঠিয়া বসিয়া সকলকে আত্মপরিচয় দিলেন ও আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বৃদ্ধ ঋষি আশ্রমে ছিলেন না ; তিনি আসিলে বীরেন্দ্র তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। ঋষি কহিলেন—"বৎস, আমি তোমার পরিচয় ও বৃত্তান্ত অবগত আছি। ত্রিশির দানব বংশজাত, অত্যন্ত পরাক্রমশালী ; তাহাকে দেবগণের বিনা সাহায্যে বধ করিতে পারিবে না। তুমি গোমুখীতে গঙ্গা-তীরে দানবারি ইন্দ্রদেবের আরাধনা কর, তিনি প্রসন্ন হইলে তোমাকে ত্রিশির বধের উপায় বলিয়া দিবেন।"

কিছুদিন আশ্রমে থাকিয়া সুস্থ ও সবলশরীর হইয়া, বীরেন্দ্র ঋষি ও ঋষিপত্নীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং গোমুখী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি এক নির্জ্জন স্থানে ইন্দ্রদেবের পূজা ও ধ্যান করিতে বসিলেন। তিনি অনাহারে অনিদ্রায় অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

মুখচন্দ্র শুকাইল, শীর্ণ হ'ল কায়,
কেশ জটাভার হয়ে ভূমিতে লুটায়।

বহুকাল এইরূপ তপস্যার পর ইন্দ্রদেব প্রসন্ন হইলেন। আকাশ-বাণী হইল—

"দৈত্যরণে ব্যস্ত এবে আছি, বাছাধন,
রণ সাঙ্গে আশা তব করিব পূরণ।

উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববরে পাঠাব তোমায়,
ত্রিশির বিনাশে তব হইবে সহায়।
তত দিন ধৈর্য্য ধরি রহ ওইখানে,
ধৈর্য্য বিনা সিদ্ধিলাভ নাহি ত্রিভুবনে।"

বীরেন্দ্র ঊর্দ্ধমুখে হাত জোড় করিয়া কহিলেন—

"দেবরাজ, আজ্ঞা তব করিব পালন,
কিন্তু কত কালে সাঙ্গ হবে দৈত্যরণ ?
মানুষ অমর নহে ; যৌবনের পরে
বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আসি গ্রাসিবেই নরে।
এক লহমায় তব যত কাল যায়,
তত কালে আমাদের জীবন ফুরায়।
উচ্চৈঃশ্রবা আসে যদি বার্দ্ধক্যে আমার,
তখন ত্রিশিরে বধি কিবা ফল আর ?
সুদক্ষিণা অন্য পতি করিবে গ্রহণ,
যদি বেঁচে থাকে, বৃদ্ধা হইবে তখন।
তত দিনে—কেন বলি ? বহু পূর্ব্বে তার,
লোহিত্যে ত্রিশির হস্তে হবে ছারখার।"

কিন্তু তিনি তাঁহার কথার কোন উত্তর পাইলেন না ; দেবরাজ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। আর উপায় কি ? রাজপুত্র আশায় বুক বাঁধিয়া গোমুখীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দিন দিন করিয়া মাস চলিয়া যাইতে লাগিল ; শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় তিনি নির্ঝরিণী তীরে জীবন কাটাইতে লাগিলেন। প্রভাতে

উঠিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ খুব প্রখর না হয়, ততক্ষণ তিনি ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন—দেখেন উচ্চৈঃশ্রবা আসিতেছে কিনা। তার পর কিছু ফলমূল আহরণ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করেন। দুপ্রহরে কোন বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জল দেখেন—দেব অশ্ব আসিতে থাকিলে জলে তাহার ছায়া পড়িবে। অপরাহ্নে আবার আকাশ পানে চাহিয়া থাকেন। সহসা মেঘ উঠিয়া সূর্য্যকে আবৃত করিলে বীরেন্দ্র চমকিয়া উঠেন—এই বুঝি অশ্ব আসিতেছে। বহু উচ্চে বিন্দুর মতন কোন পক্ষী দেখিলে তাঁহার অশ্ব বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপে তাঁহার দিন যায়, কিন্তু ধৈর্য্য ফুরায় না। নিকটবর্ত্তী পল্লী সকল হইতে বৃদ্ধ কৃষকগণ ও স্ত্রীলোকগণ নির্ঝরিণীতে আইসে। কৃষকেরা প্রথম প্রথম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত—

"কে তুমি? কোথায় বাস? হেথা কি কারণ?
কি কর তটিনীতটে বসি সর্ব্বক্ষণ?"

তাহারা কখনো আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিত—

"অবিরল চেয়ে থাকে আকাশের পানে,
কোন বা জ্যোতিষী হবে এই লয় মনে।"

কখনো বলিত—

"অবিরত এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে জল;
কিসের জ্যোতিষী? এটা নিশ্চয় পাগল।"

বীরেন্দ্র প্রথম প্রথম উত্তর করিতেন—

"উচ্চৈঃশ্রবা, দেব-অশ্ব আসিবে হেথায়,
আমি হেথা বসে আছি তার অপেক্ষায়।"

শুনিয়া কেহ কেহ হো হো করিয়া হাসিত, বলিত,"—শোন, পাগল বলে কি!" কেহ কেহ বা চোখ টেপাটিপি করিত; জিজ্ঞাসা করিত—"কেন বাপু, দেব-অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা এখানে কি করিতে আসিবে? তোমারি বা তাকে দিয়ে কি প্রয়োজন?"

বীরেন্দ্র কহিতেন—

"ইন্দ্রের আদেশ এই, সহায়ে তাহার,
ত্রিশির দানবে আমি করিব সংহার।"

তাহাতে অসভ্য কৃষকগণের আরও কৌতুক বাড়িত। তাহারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু বীরেন্দ্র তাহাদের উপহাস বুঝিতে পারিয়া আর বেশী কিছু কহিতেন না। কৃষক-পত্নীরা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইত। তাহাদের অনেকেই বিশ্বাস করিত যে, দেব অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা আসিবে, এবং ঐ অপরিচিত পরম সুন্দর যুবক তাহার সহায়তায় ত্রিশির নামক দানবকে বধ করিবে। তাহারা তাঁহাকে পাগল ভাবিত না। কোন যুবতী বলিত—

"কিবা রূপ, কিবা বর্ণ, কিবা লো নয়ন!
ও বিধি! এমন আর করনি সৃজন!"

কেহ বা বলিত—

"ইনি জ্যোতিষিক নন, নহেন পাগল,
ইনিবা দেবতা কোন করি'ছেন ছল।"

প্রৌঢ়াগণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার উদ্দেশে কহিত—

"কোন্ অভাগীর কোল আঁধার করিয়া,
হেথারে, পূর্ণিমা চাঁদ, আছ লুকাইয়া?"

কেহ কেহ তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিত ও আপনাদের পুত্রকন্যার জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিত।

ষোল সতের বৎসরের একটী লাবণ্যবতী বালিকা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়াছিল। সে তাঁহার পার্শ্ব প্রায় ত্যাগ করিত না। বালিকাটীর নাম সুনন্দা। সে বীরেন্দ্রের বৃত্তান্তের প্রত্যেক কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও নির্ঝরিণীর পানে তাকাইয়া উচ্চৈঃশ্রবার প্রতীক্ষা করিত। বীরেন্দ্র তাহাকে আপানার পরিচয় দিয়াছিলেন, সুদক্ষিণার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার আশা, ভরসা, সুখ দুঃখের কথা সমস্তই তাহাকে বলিয়াছিলেন। সে সে সব কথা কাহাকেও বলিত না। সে বন হইতে তাঁহাকে ফল আনিয়া দিত, নির্ঝর হইতে জল তুলিয়া দিত এবং তাঁহার মনে বিষাদ ও হতাশার ভাব উপস্থিত হইলে তাঁহাকে উৎসাহিত ও প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত। কহিত—

"রাজপুত্র, বিষাদিত করিও না মন;
আমার প্রাণেতে এই ল'তেছে এখন—
অতি শীঘ্র উচ্চৈঃশ্রবা আসিবে হেথায়
ত্রিশিরবিনাশে তব হইবে সহায়;
অনায়াসে তুমি দুষ্টে করিবে সংহার,
তোমার যশেতে পূর্ণ হইবে সংসার।

তার পর ? তার পরে বল তো কি হবে ?—
স্নদক্ষিণা সনে তব বিবাহ হইবে !"

এই কথা বলিয়াই পাগলিনী হাততালি দিয়া হি হি করিয়া হাসিতে থাকিত, কখনো বা নাচিত, কখনো গাইত—

"সব সখী মিলি দিবে হুলাহুলি
গলে পরাইবে কুসুম হার,
এ জটা কাটিবে কেশ বিনাইবে,
মুকুট 'পরাবে, রাজকুমার।
বিভূতি মুছিয়া, হলুদ মাখিয়া,
সোণাতে, মণিতে মিলাবে ভাল;
গাছের বাকলে ফেলাইবে জলে,
চিকণ বসনে করিবে আলো।
সেই সোহাগিনী, রাজার নন্দিনী,
আঁচলে আনন মুছাবে যবে,
ওহে যুবরায়, কহ তো আমায়,
এ বিষাদভার কোথায় রবে ?" (১)

পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া আন্তরিক ব্যগ্রতার সহিত কহিত—

"হ্যাঁগো, রাজপুত্র, সেই রাজার ঝিয়ারী
সত্যই কি তার মত নাহিক স্নন্দরী ?
তোমারি মতন মুখ, তোমারি বরণ,
তোমারি মতন কিগো স্নন্দর নয়ন ?

(১) রাগিণী—আলেয়া, তাল একতালা।

তোমারি মতন কিগো সুধামাখা স্বর,
তোমারি মতন তার মধুর অন্তর ?—
আমার তো, যুবরাজ, এই লয় মনে
তোমার মতন আর নাহিক ভুবনে !”

সরলা এই বলিয়া বীরেন্দ্রের মুখপানে তাকাইয়া থাকিত। বীরেন্দ্র হাসিতেন ও কহিতেন—“দূর্,পাগ্‌লি !” আর সুনন্দার চুলগুলি লইয়া খেলা করিতেন। কখনো বা সে প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়া অতি আগ্রহের সহিত রাজকুমারকে কহিত—

“দেখ, রাজপুত্র, আজ দেখেছি স্বপন
উচ্চৈঃশ্রবা আসিয়াছে তোমার কারণ ;
ইন্দ্র তোমা দিয়াছেন বজ্রখানি তাঁর
মহাদেব দিয়াছেন ত্রিশূল তাঁহার।
তার পর, দেবঅশ্বপৃষ্ঠে আরোহিয়া
কোথা যে চলিয়া গেলে পাই না খুঁজিয়া !
কাঁদিতে কাঁদিতে উঠি বিছানা হইতে
সত্যই গিয়াছ নাকি এসেছি দেখিতে।”

কখনো কখনো বীরেন্দ্র বালিকার নিকট ত্রিশিরের ভীষণ মূর্ত্তি বর্ণন করিতেন এবং তাহার সহিত আপনার যুদ্ধবৃত্তান্ত কহিতেন। বালিকা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া তাঁহার কোলের কাছে সরিয়া বসিত ; তাঁহার শরীরের ক্ষতগুলিতে হাত বুলাইয়া দিত। কখনো সুদক্ষিণার প্রতি সুনন্দার অত্যন্ত রাগ হইত। সে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিত—

"বড়ই পাষাণী এই নারী, যুবরায়,
কোন্ প্রাণে হেন রণে পাঠাল তোমায় ?
রূপসী লাভের আর্শে তাঁহার মতন
মানুষে করিবে কিগো অসাধ্যসাধন ?
তাঁর মত রূপবতী প্রাণপাত বিনে
কোথাও মিলে না কিগো এ বিশ্বভুবনে ?
তুমি যদি ইচ্ছা কর—মানুষ তো ছার—
রতি আসি সেবাদাসী হইবে তোমার।
আমাকে লইয়া যেও বিবাহের কালে,
দুকথা শুনাব তাঁকে, যা থাকে কপালে !"

বীরেন্দ্র বলিতেন,—"তোমাকে নিয়ে যাব বই কি ? তুমি যাবে আর দিনরাত তার সঙ্গে কোন্দল করিবে !" বালিকা দুঃখিতা হইয়া বলিত,—"না, কোন্দল করিব না। তুমি যাঁকে ভালবাসবে আমি কি তাঁকে ভাল না বেসে পারি ? আমি তোমার রাণীকে খুব ভালবাসিব ; এক বার মাত্র কহিব,—

"ত্রিশিরের রণে তোমা পাঠায়ে আপনি
বড় কঠিনার কাজ করেছেন তিনি।"

কোন কোন দিন দুজনে বসিয়া উচ্চৈঃশ্রবার বিষয় গল্প করিতেন—উচ্চৈঃশ্রবা দেখিতে কেমন ? তার পাখা আছে কিনা ? পাখা না থাকিলে আকাশে চলে কেমন করিয়া ? সুনন্দা কহিত,—

"স্বপনে দেখেছি আমি দুগ্ধের মতন
অমল ধবল সেই অশ্বের বরণ ;

পুষ্পের কেশর সম উজ্জ্বল চিকুর,
গ্রীবাদেশে মন্দ মন্দ উড়ে ফুর ফুর ;
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় তার যুগল নয়ন,
তার হ্রেষা ধ্বনি যেন বাঁশীর বাদন ;
সুবর্ণের মুখরজ্জু হীরক খচিত,
সূর্য্যের কিরণ তাহে হয় পরাজিত।”

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেন—“সুনন্দে, তুমি তাহার পাখা দেখিয়াছ ?” বালিকা কহিত—

“পাখা দেখি নাই, কিন্তু পাখা যদি নাই
কেমনে সে শূন্যে উড়ে বুঝিতে না পাই।”

বীরেন্দ্র কহিতেন—“তাহাতে আশ্চর্য্য কি সুনন্দে ? দেবতার অশ্ব, দেবশক্তি বলে যথাতথা বিচরণ করে।”

এইরূপ ভাবে চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইলে বীরেন্দ্রনারায়ণের ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হইল। এক দিন মধ্যাহ্নকালে তিনি ও সুনন্দা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় উল্কাপাতে যেমন চতুর্দ্দিক আলোকিত হয়, তেমনি চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল এবং এক মুহূর্ত্তকাল আকাশে শন্ শন্ শব্দ হইল। তার পর তাঁহাদের সম্মুখে স্বয়ং দেবঅশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা উপস্থিত। তাহার পা মাটিতে ঠেকিতেছে না—মাটির চার পাঁচ অঙ্গুলি উপরে ভাসিতেছে। সুনন্দা যেমন স্বপ্নে দেখিয়াছিল তাহার রূপ অবিকল সেই প্রকার। তাহার প্রভায় চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইতেছে। তাহার মুখে হীরামণ্ডিত স্বর্ণতারের বল্‌গা, তাহার পৃষ্ঠে পারিজাত ফুলের

আসন—সৌরভে আকাশ আমোদিত হইতেছে। বীরেন্দ্র ও সুনন্দা উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও বিস্ময়ে পটে চিত্রিত মূর্ত্তির ন্যায় নীরব ও নিশ্চল হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে আকাশবাণী হইল—

"দেবাদেশে উচ্চৈঃশ্রবা এবে উপস্থিত,
সত্বরে, হে রাজপুত্র, করহ বিহিত।
নির্ঝরিণী জলে দেহ করি প্রক্ষালন
শুচি হয়ে অশ্ব পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
সাহসে যুঝিও, বৎস, দানব-সমরে,
লভিবে বিজয়লক্ষ্মী দেবেন্দ্রের বরে।
পৃথিবীর স্থূল বায়ু নিশ্বাসে কাতর
উচ্চৈঃশ্রবা, দেখ, বীর; হওহে সত্বর।"

বীরেন্দ্রের হঠাৎ জ্ঞান হইল: তিনি দেখিলেন, সত্যই উচ্চৈঃশ্রবা অত্যন্ত চঞ্চলতা দেখাইতেছে। পৃথিবীর স্থূল ও মলিন বায়ুর নিশ্বাস লইতে যেন তাহার বড় কষ্ট হইতেছে; পৃথিবীর ধূলি স্পর্শে যেন তাহার বিমল শরীর মলিন হইতেছে। রাজপুত্র আর বিলম্ব করিলেন না; ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক নির্ঝরিণীর জলে পতিত হইয়া স্নান করিলেন। তার পর ভক্তিভরে দেবাদিদেব মহাদেব ও ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিলেন। তিনি ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবাকেও পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা ও প্রণাম করিলেন। অশ্ব এই পূজা পাইয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। সে মৃদুবংশীর স্বরে দুই চারি বার হ্রেষাধ্বনি করিল ও পুচ্ছ নাড়িয়া আনন্দ দেখাইতে

লাগিল। সুনন্দা তখনও অবাক্ হইয়া বীরেন্দ্রের ও অশ্বের কার্য্য দেখিতেছিল। বীরেন্দ্র তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিয়া কহিলেন—

"সুনন্দে, সরলে, তবে চলিনু এখন,
কার্য্যসিদ্ধি হলে তোমা'করিব স্মরণ।"

সুনন্দা কোন উত্তর করিতে পারিল না, কেবল বীরেন্দ্রের মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এদিকে উচ্চৈঃশ্রবা আবার হ্রেষাধ্বনি করাতে রাজপুত্র বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বের নিকট আসিলেন এবং তাহাকে পুনর্ব্বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহার বল্গা ধরিয়া এক লম্ফে তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলেন। যেই আরোহণ করিলেন, আর অমনি যেন—

দূরে গেল মানুষের ক্ষুদ্রতা নিচয়,
অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতা, রোগ, তাপ, ভয় ;
সাহস, বিক্রম, বীর্য্য, জ্ঞান অতুলন,
অমরত্ব জনমিল মুহূর্ত্তে যেমন।
বহিল অমৃত স্রোত শিরায় শিরায়,
পৃথিবীর মলিনতা ধুয়ে মুছে যায়।

বীরেন্দ্র তখন ত্রিশিরবিনাশের কথা মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন—এই বিনাশ কার্য্য এত দিন কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল! তিনি এখন মনে করিলেন, ত্রিশির বধ তো অতি তুচ্ছ, দেবাদেশে তিনি সমস্ত দৈত্যকুলের সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন।

উচ্চৈঃশ্রবা পবন বেগে বায়ুভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল।

আহা কি মনোরম গতি! আর পদতলস্থ পৃথিবীর কি সুন্দর দৃশ্য! বীরেন্দ্র প্রথমে দেখিলেন, বালিকা সুনন্দা ঊৰ্দ্ধে দুই বাহু তুলিয়া ঊৰ্দ্ধমুখে চাহিয়া আছে। তার পরে আর তাহাকে লক্ষ্য করা গেল না; সেতো ক্ষুদ্র বালিকা, সেতো দূরের কথা—

বড় বড় গিরি, নদী, কানন, নগর
ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র হতে হলো ক্ষুদ্রতর;
শেষে পৃথিবীর গায় মিলাইয়া যায়,
ধূমরাশি ক্রমে যথা বায়ুতে মিলায়।

বরাবর ঊৰ্দ্ধে উঠিয়া উচ্চৈঃশ্রবা প্রথমে পূর্ব্বমুখে ছুটিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে যে স্থানে ত্রিশিরের আবাস, ঠিক তাহার ক্রোশ খানেক উপরে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অশ্ব হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল; বীরেন্দ্র বুঝিলেন, সে তাঁহাকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে বলিতেছে। তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণধার তরবারি কোষ হইতে খুলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন এবং আসনে খুব শক্ত হইয়া বসিলেন। অশ্ব মৃদু গতিতে নামিতে লাগিল। বীরেন্দ্র দেখিলেন, উপত্যকা হইতে তিন ধারে ধূম উঠিতেছে—সে ধূমের গন্ধ অতি বিষাক্ত! বুঝিলেন, ত্রিশিরের তিন নাসিকা হইতে ঐ ধূম নির্গত হইতেছে। আরো দেখিলেন, অনেক অস্ত্র, শস্ত্র, শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ, বর্ম্ম ইত্যাদি যুদ্ধ সজ্জা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; বুঝিলেন, ত্রিশিরের সহিত যুদ্ধে অনেক সৈন্য সামন্ত নিহত হইয়াছে। তিনি তাঁহার আপন সৈন্যগণ এবং সহযোগী রাজপুত্রগণের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

এমন সময়ে উচ্চৈঃশ্রবা উপত্যকার শত হস্ত পরিমাণ উপরে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রনাদের ন্যায় ঘোর ভীষণ হ্রেষাধ্বনি করিল। তাহাতে চরাচর চমকিত ও ভীত হইল। এই কি মধুর বংশী-ধ্বনি? দেবঅশ্ব যুদ্ধকালে বংশীধ্বনি করে না, যুদ্ধকালে তাহার নাদে ত্রিভুবন কম্পিত হয়। সেই ঘোর গভীর হ্রেষাধ্বনি হইবা মাত্র উপত্যকায় যেন দাবানল প্রজ্বলিত হইল, এবং বিকট গর্জ্জন এবং ফোঁস্ ফোঁস্ এবং ভ্যা ভ্যা শব্দে চতুর্দ্দিক প্রপূরিত হইল। ত্রিশির ভীষণ আস্ফালন করিতে লাগিল। পশ্চাতের পদে ভর করিয়া লম্ফ দিয়া অশ্বকে আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল। উচ্চৈঃশ্রবা তীরবৎ বেগে ছুটিল। বীরেন্দ্র-নারায়ণ দুই হস্তে তরবারি ধরিয়া, এক আঘাতে ত্রিশিরের ছাগ-মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অশ্ব আবার বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল। দানব যাতনায় গগনভেদী চীৎকার করিতে লাগিল; লেজে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া, ফণা ও নখর দ্বারা পর্ব্বতচূড়া সকলে এমন বজ্রসম তেজে আঘাত করিতে লাগিল যে চূড়াসকল চূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। পর্ব্বতস্থ পশুপক্ষিগণ ও পর্ব্বতপাদ দেশস্থ গ্রামবাসিগণ প্রমাদ গণিয়া আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। দেবঅশ্ব আবার বিদ্যুৎ বেগে ছুটিল, বীরেন্দ্র আবার তরবারি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন। এবারে ত্রিশিরের সিংহমস্তক কাটা গেল। রক্তের উৎস উঠিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীকে আপ্লুত করিল। তাঁহারা কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত আকাশপথে ছুটিতে লাগিলেন। দানবের এখন একমাত্র

সর্পশির অবশিষ্ট; সে ফণা বিস্তার পূর্ব্বক আকাশ আবৃত করিল। পৃথিবীর লোকে মনে করিল, সূর্য্য মেঘের আড়ালে লুকাইলেন। তাহার মুখ হইতে অগ্নি ও তীব্র বিষ ও চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিশিখা সকল নির্গত হইয়া যে স্থানে পঁহুছিল, সেই স্থান দগ্ধ হইল; বিষের প্রস্রবণ উঠিল—বিষের নদী বহিল, বায়ু ঘোর বিষাক্ত হইল। কিন্তু ত্রিশিরের সময় নিকট। উচ্চৈঃশ্রবা আর একবার তীরবেগে অবতীর্ণ হইল। বীরেন্দ্র আর এক বার অমিততেজে সর্পের মস্তকে আঘাত করিলেন। তখন সব ফুরাইল। ত্রিশির ছিন্ন হইয়া ভীমরবে পর্ব্বতোপরি পতিত হইল। তাহার অস্থি দ্বারা হিমালয়ের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে উচ্চৈঃশ্রবা পর্ব্বতোপরি অবতীর্ণ হইল। বীরেন্দ্র তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন; কহিলেন—

"ক্ষম দোষ, উচ্চৈঃশ্রবা, ইন্দ্রের আজ্ঞায়,
পদস্পর্শে কলঙ্কিত করিয়াছি কায়।"

অশ্ব অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মধুর হ্রেষাধ্বনি করিল। তখন দুজনে এক নির্ঝরের জলে গাত্র ধৌত করিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা আর অপেক্ষা করিল না; মধুর নাদ করিতে করিতে আকাশপথে অন্তর্হিত হইল। বীরেন্দ্রও লোহিত্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এখন সুদক্ষিণার বিবরণ বলি শোন। তিনি স্বয়ম্বরসভায় বীরেন্দ্রের দেবমূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি

তাঁহার গলে তখনি ফুলের মালা পরাইতেন; কেবল আপনার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া তাহা করেন নাই। তার পর বীরেন্দ্রের বিদায়লিপি পাইয়া তাঁহার মন আরো গলিয়া গিয়াছিল। তিনি অনেক সময় আপনাকে তিরস্কার করিতেন, অনেক সময় বিরলে বসিয়া সখীর নিকটে বীরেন্দ্রের জন্য কাঁদিতেন।—

"আমি কি পাষাণী, হায়, এমন সমরে
কেন অবহেলে, সখি, পাঠাইনু তাঁরে।
নরের দুরূহ কার্য্য, ত্রিশির বিজয়,
বড় ভয় করি মনে কি জানি কি হয়।"

সখী তাঁহাকে কত সান্ত্বনা করিত, কিন্তু তাঁহার মন প্রবোধ মানিত না। তিনি বীরেন্দ্রের মঙ্গলার্থে একান্তমনে শিবপূজা করিতেন এবং পূজা অন্তে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করিতেন—

"হে দেব, হে শূলপাণি, দৈত্য বিনাশন,
দাসীর বাসনা, প্রভো, করহ পূরণ।
ত্রিশিরে বিনাশ করি বীরেন্দ্র আ—মা—র,
অক্ষত শরীরে ফিরে আসুন আবার।"

'বীরেন্দ্র আমার' বলিতে তাহার বড় লজ্জা হইত; বীরেন্দ্র কি তাঁরই? যাহা হউক, তিনি দিবারাত্রি এইরূপ প্রার্থনাই করিতেন। পরিণয়প্রার্থী অন্যান্য রাজপুত্রগণের প্রতি তাঁহার মন ছিল না। বীরেন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য বিনাশ ও তাঁহার নিজের অদৃশ্য হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া

রাজপুত্রগণের মধ্যে অনেকেই ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন। যে দুই চারি জন ইহার পরেও যুদ্ধে গিয়াছিলেন তাঁহারা প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বীরেন্দ্রের বিষয়ে সঠিক খবর কেহ বলিতে পারিত না। কেহ বলিত, তিনি নিহত হইয়াছেন; কেহ বলিত, তাঁহার বাঁচিয়া থাকাই সম্ভব। বীরেন্দ্রের এক জন সৈনিক এই কথা বলিয়াছিল; সে বলিয়াছিল—"আমি দেখিয়াছি, যুবরাজ ত্রিশিরের সহিত ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে পা পিছলিয়া নিম্নস্থিত নির্ঝরে পড়িয়া গেলেন। আমি পরে নীচে নামিয়া নির্ঝর জলে বহু দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাই নাই। নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম একটী লোককে আর কয়েকজন লোকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা সেই পল্লীবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়াছে; কিন্তু তাহারা কে এবং কাহাকে লইয়া কোথায় গিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না। আমি আর কিছুই জানিতে পারি নাই।"

সুদক্ষিণা আশায় বুক বান্ধিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাণেও এই লইত যে বীরেন্দ্রনারায়ণ জীবিত আছেন ও শীঘ্রই দেখা দিবেন। আবার পরক্ষণেই বিষাদ উপস্থিত হইত—

"ত্রিশিরে না বধ করি আসিলে কুমার,
বিবাহের পণরক্ষা হলো না তো আর;
হায়, অভাগিনী আমি কেন বা এমন
সভা মধ্যে করিলাম অসম্ভব পণ?"

মাসের পর মাস, ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে

লাগিল। বীরেন্দ্র তবু ত্রিশিরকে বধ করিয়া ফিরিলেন না। রাজা লীলাবতু তাঁহার কন্যার বীরেন্দ্রের প্রতি অনুরাগের কথা সখিমুখে শুনিয়াছিলেন। এসব কথা কি গোপন থাকে? তিনিও কখনো কখনো বীরেন্দ্রের পুনরাগমনের বিষয়ে আশান্বিত হইতেন; কিন্তু কদাচিৎ। তিনি সৈনিকের কথা বড় বিশ্বাস করিয়াছিলেন না।

এদিকে সুদক্ষিণা বয়স্থা হইয়াছেন; কত কাল আর তাকে ঘরে রাখা যায়? রাজা মন্ত্রিগণ ও রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া দ্বিতীয় বার স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিবেন স্থির করিলেন। কন্যাকে সহচরীদের দ্বারা প্রবোধ দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। বীরেন্দ্রের কথা কহিলেন,—

"পাঁচ বৎসরের কথা, সেতো অল্প নয়,
জীবিত থাকিলে দেশে আসিত নিশ্চয়।
পিতা তাঁর দেশে দেশে দূত পাঠাইয়া
কোথাও সে যুবরাজে পান নি খুঁজিয়া।"

এই বলিয়া তিনি প্রধানা সখীকে কহিলেন,—

"এত দিন এত কথা বলিনি কন্যায়
কোমল হৃদয়ে তার পাছে ব্যথা পায়।
কত কাল কুমারীকে ঘরে রাখি আর?
দেশে দেশে অপযশ হইবে আমার।
ত্রিশির হলো না হত, হবে না কখন;
কন্যার কঠিন পণ হবে না রক্ষণ।

না হলো ; দ্বিতীয় বার করি স্বয়ম্বর,
কন্যার মিলাব আমি উপযুক্ত বর।
দেশে দেশে করিব এ সংবাদ প্রেরণ,
শুনিয়া বীরেন্দ্র (ও) কিবা করে আগমন।”

সুদক্ষিণা দ্বিতীয় বার স্বয়ম্বরের কথা শুনিতেও পারিতেন না। তিনি প্রধানা সখীকে কহিতেন,—

“পিতাকে কহিও, সখি, বৃথা আয়োজন ;
দেবতা সাক্ষাৎ পতি করেছি গ্রহণ !
জীবনে মরণে আমি সদাই তাঁহার,
অন্য কারো গ্রহণের যোগ্যা নহি আর।
এজীবনে দেখা যদি না হয় কখন
স্বর্গধামে আমাদের হইবে মিলন।
শুধু ইহ কাল তরে নহে পরিণয়,
এদৃঢ় বন্ধন, সখি, জন্ম জন্ম রয়।

লীলাবতু প্রথম এসব কথা শুনিয়া ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু শেষে আর শুনিলেন না। শেষে কন্যাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন ; এমন কি দুঃখিনীর প্রতি উৎপীড়ন পর্য্যন্তও হইতে লাগিল। সুদক্ষিণা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেন আর কাঁদিতেন। কাঁদিয়া কহিতেন,—

“এই কি অদৃষ্টে ছিল ? হায়, ভগবন,
মহাদেব, বৃথা তোমা করিনু পূজন !”

লীলাবতু স্বয়ম্বরের আয়োজন করিলেন। আবার দেশে দেশে

নিমন্ত্রণ গেল; আবার নানাস্থান হইতে রাজপুত্রগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। বীরেন্দ্রনারায়ণ ত্রিশিরকে বধ করিয়া লোহিত্য রাজ্যের মধ্য দিয়া রাজধানীতে যাইতেছিলেন; পথে লোক মুখে তাঁহার প্রতি সুদক্ষিণার অনুরাগ, তাঁহার দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরে অনিচ্ছা, রাজার ক্রোধ, এবং পুনরায় স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করার বিষয় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বলিত,—

"রাজকুমারীর দুঃখে বুক ফেটে যায়,
এমন অবোধ পিতা দেখিনি কোথায়।
বিবাহে কন্যার যদি ইচ্ছা নাহি থাকে,
পিতা কি গো জোর করে বর দিবে তাকে।
কাল হবে স্বয়ম্বর, কি জানি কি হয়,
কুমারী বা আত্মহত্যা করে মনে লয়।"

এই সব কথা শুনিয়া বীরেন্দ্র অধীর হইলেন। তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি পথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার পদ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। তিনি এক গ্রাম হইতে একটী অশ্ব লইলেন; কতকদূর যাইয়া সেটী ক্লান্ত হইয়া পথে পড়িয়া মরিল। রাজপুত্র আবার পদব্রজে চলিলেন।

লীলাবতুর রাজধানীতে নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বয়ম্বর সভা বসিয়াছে; চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে; বহুসহস্র দর্শক, বাদক, গায়ক ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া উৎসব করিতেছে। রাজার আজ্ঞাক্রমে সুদক্ষিণার সখীগণ তাঁহাকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া, হাতে

দধিপাত্র ও পুষ্পমালা দিয়া সভায় লইয়া আসিয়াছে। বেত্রবতী অবগুণ্ঠনবতী রাজকন্যাকে লইয়া প্রত্যেক রাজপুত্রের নিকট গেল এবং তাঁহার নিকট রাজপুত্রদের পরিচয়, রূপ, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ইত্যাদির বর্ণনা করিল ; আর শেষে কহিল,—

"এই রাজপুত্রে, সখি, করহ বরণ,
রতি কামদেবে যেন হইবে মিলন।"

সুদক্ষিণা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বেত্রবতীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলেন। তিনি যে কিছু শুনিলেন, অথবা দেখিলেন এমত বোধ হইল না। কাহারও গলে বরমাল্য দিলেন না, কাহাকেও বরণ করিলেন না। তখন সভামধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। রাজপুত্রগণ একবাক্যে লীলাবতুকে কহিলেন,—

"একি অপমান ?—একি ঘোর অপমান ?
কি কারণে আমাদিগে করিলে আহ্বান ?
এক বার কন্যা তব করিলেন পণ—
অসম্ভব পণ—যার হয় না পালন।
এবার আরেক খেলা—শুন মহারাজ,
হেথায় দুয়ের এক হইবেই আজ—
হয় কন্যা বরমাল্য করিবে প্রদান,
অথবা তোমাকে রণে করিব আহ্বান।"

লীলাবতু ক্রোধে ও ক্ষোভে কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—

"পাপিয়সি, লজ্জা দিলি সভার গোচর,
কলঙ্ক রাখিলি নামে সংসার ভিতর।

অপমান করিলিরে সভাশুদ্ধ জনে,
কি ক'রে বুঝাই এই রাজপুত্রগণে ?
আজি খেদাইব তোরে—দিব বনবাস,
হায়রে অদৃষ্ট ! হায়, হায়, সর্ব্বনাশ।”

দর্শকগণের মধ্যেও মহাকোলাহল হইতে লাগিল। কেহ কেহ চীৎকার করিয়া বলিল,—

“ধন্য সুদক্ষিণে, ধন্য সতীত্ব তোমার,
তোমার মহিমা গাবে জগতসংসার।”

কেহ কেহ বা রাজার কথায় সায় দিয়া কহিল,—

“একি বাচালতা, একি খেলা, উপহাস,
একি কলঙ্কের কথা, একি সর্ব্বনাশ ?”

এমন সময় বীরেন্দ্রনারায়ণ ভিড় ঠেলিয়া দ্রুতবেগে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার পদদ্বয় ধূলিতে মলিন ও রক্তাক্ত ; তাঁহার শরীরে ঘর্ম্মের স্রোত বহিতেছে ; তাঁহার কেশ ও বেশভূষা আলুলায়িত। বীরেন্দ্র একেবারে সুদক্ষিণার সম্মুখে গিয়া গদগদ্ স্বরে কহিলেন—“সুদক্ষিণে, আমি আসিয়াছি।” রাজকুমারী একবারমাত্র বীরেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিলেন ; অমনি তাঁহার পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না কি ? ভাঙ্গিল বই কি। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল ; সকলের বিস্ময় দূর হইল, সকলে আগ্রহের সহিত, বিস্ময়ের সহিত, প্রশংসার সহিত, পুলকিত কলেবরে, বীরেন্দ্রের মুখে ত্রিশির বিনাশবৃত্তান্ত শুনিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি ও

কোলাহল উত্থিত হইল। পরে সুদক্ষিণা বীরেন্দ্রনারায়ণের গলে বরমাল্য পরাইলেন। আমার সব কথা ফুরাইল। কেবল একটী ব্যতীত; সেটী এই—বিবাহের পর বীরেন্দ্র সুনন্দাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। দূত একাকী ফিরিয়া আসিয়া জানাইল,—"যুবরাজ, সে বালিকা উদাসিনীবেশে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।" মেয়েটা না বুঝিয়া, বীরেন্দ্রনারায়ণকে বড় ভালবাসিয়াছিল বোধ হয়; কিন্তু বাসিলে কি হইবে? অত ছোটতে বড়তে বিয়ে সাজে না; তাও বটে, আর বিশেষ, সুদক্ষিণার তাহলে কি গতি হইত? আচ্ছা, বলতো শুনি, সুদক্ষিণার সঙ্গে যে বীরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল তাতেই তোমরা বেশী খুসি—না সুনন্দার সঙ্গে বিবাহ হইলে বেশী খুসি হইতে?

বজ্রবাহুবীর ও দৈত্যগণ

বজ্রবাহুর ন্যায় বীর সেকালে কেহ ছিল না, একালেও যে এ পর্য্যন্ত কেহ জন্মে নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তিনি ভীমসেনের ন্যায় গদাযুদ্ধ করিতেন। তাঁর গদার আঘাত যাঁর শরীরে পড়িত, তিনি দেবই হউন, দৈত্যই হউন, যাই হউন না কেন, তাঁকে আর উঠিয়া বসিতে হইত না। তাঁর অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা কয়েকটা বলিতেছি, শুন।—তিনি যখন পাঁচ মাসের শিশু, সেই সময় নাগরাজ বাসুকী তাঁহাকে বধ করিবার জন্য দুই বিশাল সর্প পাঠাইয়া দেন। বজ্রবাহু দুহাতে দুটাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিয়া ফেলেন। যখন তিনি নিতান্ত বালক তখন এক দিন খেলা করিতে করিতে এক বনের মধ্যে যাইয়া পড়েন; সেখানে একটা প্রকাণ্ড সিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি সেটাকে কীল ও লাথির আঘাতে বিনাশ করিয়া তাহার কেশরগুলি দ্বারা নিজের মস্তক সজ্জিত করেন। তার পর তিনি এক পর্ব্বতে শতশীর্ষ নামক মহানাগের সহিত যুদ্ধ করেন। এই নাগের একশত মস্তক ছিল; তার একটী কাটিলে তৎক্ষণাৎ তাহার স্থানে আর একটী জন্মিত। বজ্রবাহু গদার আঘাতে পর্ব্বতটী ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে নাগকে ফেলেন ও শেষে

তাহাকে পর্ব্বতের দুই খণ্ডের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া দম বন্ধ করিয়া তাহার প্রাণবধ করেন। যখন এই বীরের বয়স আট নয় বৎসর, সেই সময় তিনি কিন্নরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার নির্ব্বংশ করেন। এই কিন্নরেরা বড় অদ্ভুত জীব। ইহাদের শরীর মনুষ্যের মত ও মস্তক ঘোড়ার মত। ইহারা দেবতাদের সভায় গান গাইত, কিন্তু মানুষের বড় অনিষ্ট করিত। কিন্নরযুদ্ধের কিছু দিন পরে বজ্রবাহু চণ্ডানাম্নী এক বীরস্ত্রী ও তাহার স্ত্রীসেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন। এই স্ত্রালোকেরা তাহাদের রাজ্যে পুরুষ থাকিতে দিত না। তাহাদের রাণী স্ত্রীলোক, কর্ম্মচারী স্ত্রীলোক, সৈন্য সামন্ত স্ত্রীলোক—সব স্ত্রীলোক। একদা বজ্রবাহু বার মাস কাল একটী হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ান ও অবশেষে তাহাকে ধরেন। ধরিয়া দেখিলেন সে হরিণ নয়, এক রাক্ষস; তখন তিনি তাহাকে বধ করিলেন। তিনি আর এক কাজ যে করিয়াছিলেন, সেটীও বড় কম নহে। উত্তরদেশে বিরাট পতির যে এক বহুযোজন বিস্তৃত আস্তাবল ছিল তাহাতে এত ময়লা সঞ্চিত হইয়াছিল যে, তাঁহার বংশধরগণ বহুসহস্র লোক নিযুক্ত করিয়াও উহার আবর্জ্জনা দূর করিতে পারেন না। পরে তাঁহাদের অনুরোধে বজ্রবাহু এই কার্য্যে হাত দেন। তিনি করতোয়া নদীটীকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখী করিয়া ঐ অশ্বশালার ভিতর দিয়া বহাইয়া দেন, তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে উহা পরিষ্কার হইয়া যায়।

এমন যে বজ্রবাহু মহাবীর তিনি একদিন তাঁহার প্রিয় অস্ত্র গদা কাঁধে ফেলিয়া এবং একটা সিংহের চর্ম্ম গায়ে দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতেছেন। যাকে রাস্তায় পান তাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—

"কোন্ পথে যাব বল বারুণী উদ্যানে,
সোণার দাড়িম্ব ফল ফলে যেই খানে;
একটীও দানা যার করিলে ভক্ষণ
অনন্ত যৌবন, শক্তি লভে নরগণ।"

শুনিয়া সবাই মনে করে এটা একটা পাগল। বারুণী উদ্যান আবার কোথায়? সোণার দাড়িম্ব ফল, বাপ্‌রে! সোণা খাবে কেমন করে? আবার খেতে পার্‌লে অনন্ত যৌবন ও শক্তি হয়; জিনিষটা তাহলে মন্দ নয়, যা হোক্। কিন্তু বজ্র-বাহুর বীরমূর্ত্তি ও তাঁহার হাতের গদা দেখিয়া কাহারও এ সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কি তাঁহার মুখের উপর হাসিতে সাহস হইত না—পাছে সেই ভীম গদা আসিয়া ঘাড়ে পড়ে।

কিছুদিন ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি কর্ণাট প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি পর্ব্বতের মধ্যস্থিত এক সুন্দর পুষ্পবনে এক দিন তাঁহার কয়েকটী অপ্সরার সহিত সাক্ষাৎ হইল। অপ্সরাগণ কেহবা অতি সুন্দর ও সুরভি ফুলের মালা গাঁথিয়া আপনাদের দেহ সাজাইতেছিল, কেহবা ফুলশয্যায় বসিয়া গান গাইতেছিল—

"গহনেও ফুল ফুটলে পরে
ভ্রমর তথায় আপনি যায়,
(তবে) যশের কুসুম তুলবে যে সে
পথ-দেখান কেন চায়?
আমরা সবে ফুলের রাণী, ফুলের খবর ভালই জানি,
কোন্ বনে কে বিরাজ করে—
কোন্ পথেতে যাওয়া যায়;
কাজের মত মালী হলে
খবর দিতে পারি তায়।"*

বজ্রবাহুকে সহসা দেখিতে পাইয়া এক অপ্সরা হাসিয়া কহিলেন,—"কি হে, তুমি কাজের মতন মালী না কি হে? তুমি কি যশের ফুলের সন্ধানে এসেছ?" বজ্রবাহু কহিলেন,—"ফুল নয়, ফলের সন্ধানে—

"কোন্ পথে যাব বল বারুণী উদ্যানে,
সোণার দাড়িম্ব ফল ফলে যেইখানে;
ইত্যাদি।"

অপ্সরা কহিলেন,—"পথ ব'লে দিতে পারি; কিন্তু তুমি পারবে কি?—

"শতবাধা, শত বিঘ্ন করিয়া লঙ্ঘন,
দুর্ব্বল মানুষ তথা যায় কি কখন।

* রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

এই বলিয়া অপ্সরাগণ নাচিতে ও গাইতে লাগিলেন।

কৌতুক-কাহিনী—৬৩ পৃষ্ঠা।

করেনি সে ফল কভু দর্শন, আহার ;
দেবতার সাধ্য নহে, কি সাধ্য তাহার ?"

বজ্রবাহু কহিলেন—"আমি বজ্রবাহু ;
বহু বাধা, বহু বিঘ্ন জীবনে আমার
এই গদা হাতে আমি হইয়াছি পার।
দেবের অসাধ্য কার্য্য করি সম্পাদন
দেবতার আশীর্ব্বাদ করেছি গ্রহণ।
দয়া করে বলে দাও কোন্ পথে যাই,
পশ্চাতে শুনিবে ফল পাই কি না পাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক ভাবে তিনি তাঁহার গদাটি স্কন্ধ হইতে নামাইলেন; নামাইতে উহা একটী নিম্ন পর্ব্বতের চূড়ার উপর পড়ায় উহা একেবারে চূর্ণ হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া গেল। তাহা দেখিয়া অপ্সরাগণ কহিলেন.—

"নামেই চিনেছি আর কিবা পরিচয় ?
তোমার বীরত্বখ্যাতি ত্রিভুবন ময়।
অবহেলে চূর্ণ কর পর্ব্বতের শির,
তোমার এ যোগ্য কাজ বজ্রবাহু বীর।
এসো হে, ফুলের মালা তোমারে পরাই
নানাবর্ণ ফুলে তব গদাকে সজাই।"

এই বলিয়া অপ্সরাগণ পর্ব্বতের ন্যায় কঠিন শরীর বজ্রবাহুকে এবং তাঁহার বিশাল গদাকে সাজাইতে সাজাইতে নাচিতে ও গাইতে লাগিলেন—

"আয় সবে মিলে যতনে সাজাই,
মাথায় পরাই কুসুমহার ;
আমাদের গাঁথা দিব্য ফুল মালা
বীর বিনা শিরে শোভিবে কার?
যশের সুরভি তোমার যেমন
তেমনি এসব ফুলের তার—
তোমাতে ফুলেতে ভালই মিলিবে
লহ, বীর, এই কুসুমভার।"*

বজ্রবাহু কহিলেন—"আপনারা আমাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন, এখন কোন্ পথে যাব বলিয়া দিন্, আমি আপন কার্য্যে যাই।" তখন একটী অপ্সরা কহিলেন,—

"পশ্চিম সাগর কূলে সুশৃঙ্গ ভূধর,
অর্দ্ধদেহজলে অর্দ্ধ মৃত্তিকা উপর।
জলে সে ডুবিত, কিন্তু করিয়া নেহার
স্থলের বিবিধ শোভা ডুবিলনা আর!
বক্রনামে জলনর কখনো কখন
সেই গিরিগহ্বরেতে করে আগমন।
তাকে যদি পাও, জেনো, সৌভাগ্য তোমার;
সে কহিবে বারুণী বনের সমাচার।"

ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বজ্রবাহু অপ্সরাগণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—"তবে আমি চলিলাম, ফিরিয়া যাইবার সময়

* রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

আবার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব।” অন্য একটী অপ্সরা উত্তর করিলেন—“ভাল ; কিন্তু এক কথা বলিয়া দেই মনে রাখিবে—

জলনর বক্র নহে পাত্র সাধারণ,
অতি দৃঢ়রূপে তারে করিও বন্ধন।
সে বড় মায়াবী, কত শত রূপ ধরে,
বিভীষিকা দেখে ভয় পেওনা অন্তরে।
কভু করিবে না হিত সহজে তোমার
বল প্রকাশিয়া কার্য্য করিও উদ্ধার।”

বজ্রবাহু গদা স্কন্ধে করিয়া পশ্চিম সাগরের দিকে চলিলেন। যখন বনের ভিতর দিয়া যান, তখন গদার আঘাতে বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া রাস্তা সোজা করিয়া লন ; যখন পাহাড় পর্ব্বত সম্মুখে পড়ে, তখন কোনটার চূড়া কোনটার বা পার্শ্বদেশ চূর্ণ করিয়া ফেলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে কিছুদিন পরে তিনি পশ্চিম সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন।

নীলাভ সে জলরাশি গভীর, অপার
গভীর গর্জ্জন ধ্বনি করে অনিবার ;
অনন্ত তরঙ্গমালা ছুটিয়া বেড়ায়
কোথা যাবে, কি করিবে ভেবে নাহি পায় !
যতদূর দৃষ্টি চলে কর নিরীক্ষণ
গগন, সলিল আর সলিল, গগন।
পৃথিবীতে আর কিছু আছে যে আবার
স্থলের নগর, গ্রাম, পর্ব্বত, কান্তার—

সাগর যাত্রীর ইহা নাহি মনে লয়,
তাহার নিকটে বিশ্ব শুধু জলময়।

বজ্রবাহু তখন অনুসন্ধান করিয়া সুশৃঙ্গ পর্ব্বতে আসিলেন। তিনি এদিক সেদিক নিবিষ্টমনে দেখিতে দেখিতে দেখিলেন যে পর্ব্বতের একটী গহ্বরের সমুদ্রের দিকে মুখ; তাহার ভিতরে ঘাস ও শৈবালে সুন্দর শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই শয্যায় একটী জীব শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে; তাহাকে একটী উন্নত ও বলিষ্ঠ শরীর মনুষ্যের মত দেখা যায়। কিন্তু,—

সমস্ত শরীরে আঁস্ মাছের মতন,
সুন্দর মাছের পুচ্ছ নাহিক চরণ,
সুদীর্ঘ সবুজ দাড়ি মুখেতে তাহার,
শিরে সন্ন্যাসীর ন্যায় শোভে জটাভার।

বজ্রবাহু আর কালবিলম্ব না করিয়া আস্তে আস্তে গহ্বরে প্রবেশ করিলেন এবং নিমেষমধ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তিতে বক্রের গ্রীবা ও কটিদেশ ধারণ করিলেন। বক্র চমকিয়া চক্ষু মেলিল ও বজ্রবাহুর হাত ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বজ্রবাহুর হাত ছাড়ান সহজ নহে। তখন সে মায়া অবলম্বন করিল—

মৃগরূপ ধরি বক্র করে আস্ফালন,
তবু বীর তারে নাহি করিল মোচন।
অনন্তর শকুনি হইল জলনর,
চঞ্চুর আঘাত করে পক্ষ ধড়ফড়।

আর(ও) দৃঢ় করি বীর ধরিলা তাহায়,
কি সাধ্য পক্ষীর সে যে ছাড়িয়া পালায় ?
নিমেষে কুক্কুর মূর্ত্তি করিল প্রকাশ—
তিন মুখে দন্ত রাশি ভীষণ বিকাশ !
ক্রোধে এক ভীম মুষ্টি করিলা প্রহার
বিনাশিতে বজ্রবাহু জীবন তাহার ;
ভীম অজগর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
জলনর করে ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন।
পাষাণে আছড়ে বীর তখন তাহায় ;
আঘাতে সর্পের প্রাণ যায় যায় যায়।
সর্ব্ব শেষে হয় বক্র রাক্ষস ভীষণ—
ছয় পদ, ছয় বাহু, ছয়টী নয়ন।
বজ্রবাহু দৃঢ়রূপে কণ্ঠে ধরি তার
বেগে উঠাইলা উর্দ্ধে মারিতে আছাড়।
কহিলা—"রে জলনর, শোন্, পাপাশয়,
আমি বীর বজ্রবাহু, আর কেহ নয় ;
সুবর্ণ দাড়িম্ব ফল বারুণী উদ্যানে
কোন পথে গেলে পাব এসেছি সন্ধানে ;
এখনি তা'বলে দিতে হইবে তোমার,
নতুবা আমার হস্তে নাহিক নিস্তার।"

বক্র বজ্রবাহুর নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, সে বুঝিল এ ছাড়িবার পাত্র নহে। তখন সে নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কোন্

পথে বারুণী উদ্যানে যাইতে হইবে তাহা বিশেষরূপে বলিয়া দিল। বজ্রবাহু তখন সন্তুষ্ট চিত্তে বক্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিলেন।

সমুদ্রতীর পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে যাইতে তিনি যে দেশে উপস্থিত হইলেন, সেখানকার অধিবাসিগণ সকলেই বামন। কেহ ছয় অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ নহে। যে ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, সে তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত দীর্ঘ। সাধারণ লোকেরা তিন অঙ্গুলি কি চারি অঙ্গুলি। তাহাদের বাড়ী ঘরগুলিও তাহাদের অনুরূপ। রাজবাড়ীতে যে দেবমন্দির ছিল, সেটী এক হাত উচ্চ; এত উচ্চ গৃহ তাহাদের দেশে আর ছিল না; সকলে উহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। তাহাদের নগরগুলি আমাদের এক একখানি বাড়ীর মত বড়, কি ইহা হইতেও ছোট; তাহাতে লক্ষ লক্ষ বামন বাস করিত। নগরের বড় বড় রাস্তাগুলি বার চৌদ্দ অঙ্গুলি প্রশস্ত। তাহাদের রাজা, রাণী, মন্ত্রী, অমাত্য, সৈন্য সামন্ত সকলই ছিল। সৈন্যগণ আপনাদিগের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর, ধনু, তরবার ও কুঠার লইয়া মহা বিক্রমে যুদ্ধ করিত। এই বামনগণের এক দৈত্যবন্ধু ছিল; তাহার নাম নরাচল। ইহারা যেমন ক্ষুদ্র, সে তেমনি বৃহৎ; সে দাঁড়াইলে তাহার মাথা মেঘ স্পর্শ করিত; তখন বামনগণ তাহার জানুর উর্দ্ধে আর কিছু দেখিতে পাইত না। তোমরা বোধ হয় বিস্মিত হইতেছ দৈত্য ও বামনে কিরূপে মিত্রভাব হইয়াছিল। কিরূপে হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা জানি যে তাহারা

নরাচল দৈত্য ও বামনগণ।

পরস্পরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং যথাসাধ্য পরস্পরের উপকার করিত। দৈত্য যেমন আকারে বৃহৎ তাহার জীবনও তেমনি দীর্ঘ ছিল; বামনেরা যেমন আকারে ক্ষুদ্র, তাহারা সেই-রূপ অল্পকাল বাঁচিত। যে পাঁচ বৎসর বাঁচিল, সে অত্যন্ত দীর্ঘজীবি। দৈত্য যে কতকাল বাঁচিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারিত না। তাহাদের অতি বৃদ্ধ পিতামহগণের কালেও যে সে এই প্রকারে জীবনযাপন করিতেছিল, একথা তাহাদের দেশের ইতিহাসে লিখিত ছিল এবং সে যে তাহাদের প্রপৌত্রগণের কালেও এই ভাবেই জীবিত থাকিবে, সে বিষয়েও তাহারা সন্দেহ করিত না। আমরা যেমন হিমালয় পর্ব্বত দেখিলে মনে করি, অনন্তকাল আছে, অনন্তকাল থাকিবে, তাহারাও নরাচলের বিষয় সেইরূপ ভাবিত। তাহারা নরাচলকে লইয়া ক্রীড়া কৌতুকও করিত। সে যখন শুইত, তখন তাহার মস্তক রাজ্যের এক সীমায় ও পদদ্বয় অন্য সীমায় থাকিত। তখন কোন জেলার লোকেরা তাহার বক্ষে, কোন স্থানের লোকেরা উদরে, কোন দেশ-বাসীরা উরুতে, কেহ বা পদে, কেহ বা মস্তকে মৈ ফেলিয়া আরোহণ করিত। শত শত লোক তাহার ললাট, কি হাতের তালু, কি বাহুর উপরে ছুটাছুটি করিত; নাকের ডগের উপরে উঠিয়া লাফ মারিয়া গালের উপর পড়িত। কেহ কেহ সাহস করিয়া তাহার কেশের মহা বনে প্রবেশ করিত; সে বন হইতে বহির্গত হওয়া অনেক সময়ে দুষ্কর হইত। বামনেরা এইরূপ খেলা করিতে গিয়া কখনও কখনও মারা পড়িত। এক বার কয়েক জন সাহস

করিয়া নরাচলের ওষ্ঠের নিকটে যাওয়ায় তাহার নিশ্বাস বায়ুর বেগে ওষ্ঠ হইতে গড়াইতে গড়াইতে কণ্ঠে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া প্রাণ হারায়। নরাচল যখন কথা কহিত, তখন বামনেরা কাণে হাত দিত; নহিলে সে গর্জ্জনে তাহারা কালা হইয়া যাইত। তাহারা নরাচলের জন্য অনেক সময় দুঃখ করিত; বলিত,—

"বেচারা একাকী এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতর;
আহা! ওর্ কেহ নাই করিবে আদর।
সংসারে যে একা তার কত যে যাতনা
যে একাকী সেই জানে, তোমরা জাননা।"

নরাচলকে দিয়া বামনগণের অত্যন্ত উপকারও হইত। অধিক বৃষ্টি হইয়া তাহাদের ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ হইলে সে আপনার দুই হাতের তালু দুইখানি নগরের উপর বিস্তার করিয়া রাখিত, তখন নগরে বৃষ্টি পড়িতে পাইত না। অত্যন্ত রৌদ্র হইলে সে সূর্য্যেরদিকে পিছন করিয়া বসিয়া, আপনার শরীরের ছায়া রাজ্যের উপরে ফেলিত, তাহাতে রাজ্য ঠাণ্ডা হইত। একবার রাজধানীতে আগুণ লাগিয়াছিল; নরাচল দুই তিন বার থুথু ফেলিয়া আগুণ নিবাইয়া দিয়াছিল। নরাচল এত কাল বামনদের সহিত বাস করিয়াছে, তাহার দ্বারা কখনও তাহাদের কোন অপকার হয় নাই; একবার মাত্র সে অসাবধানে বসিতে যাইয়া তাহাদের কয়েকটী জেলা ধ্বংস করে। সে বহু দিন পূর্ব্বের কথা। কিন্তু সেই অবধি সে রাজ্যের সীমার বাহিরে থাকিত, ভিতরে প্রবেশ করিত না।

এই যে নরাচল দৈত্য সে একদিন লম্বা হইয়া শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে, আর হাজার হাজার লোক তাহার শরীরের উপরে উঠিয়া খেলা করিতেছে এমন সময় কয়েক জন তাহার ললাটের উপরে উঠিয়া দেখিতে পাইল আকাশ প্রান্তে কাল পর্ব্বতের মত কি দেখা যাইতেছে। ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুকাল পরে দেখিল উহা পর্ব্বত নয়, ক্রমে যেন অগ্রসর হইতেছে। তবে কি এ আর কোন দৈত্য? তখন তাহারা মহা ভীত হইল ও ব্যস্তভাবে নরাচলকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই চারি শত বামন তাহার দুই কাণের নিকট যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল,—

"উঠ নরাচল, শীঘ্র মেল হে নয়ন,
আর এক দৈত্য বুঝি করে আগমন।"

নরাচল গভীর নিদ্রা যাইতেছিল সে আর উঠে না। তখন বামনগণ তাহাকে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরবারি ও বর্শা দ্বারা চোখে মুখে আঘাত করিতে লাগিল। মশার দংশনে লোকে যেমন বিরক্ত হয়, নরাচল সেইরূপ বিরক্ত হইয়া—'উহু! আহা! করিতে লাগিল, দুই চারিবার হাই তুলিল, দুই একবার গা মোড়া দিল, তাহাতে দুই চারি শত বামন পড় পড় হইয়া কোন রূপে রক্ষা পাইল; কিন্তু নরাচল তো চক্ষু মেলিল না। তখন বামনগণ তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঢাক, শঙ্খ কাঁশর প্রভৃতি আনিয়া তাহার কাণের কাছে মহারবে বাজাইতে লাগিল ও পুনঃ পুনঃ তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল; আর কয়েক শত

লোক তাহার কাণে পড়িয়া অনবরত চীৎকার করিতে লাগিল,—

"নরাচল—নরাচল, উঠহে ত্বরায়,
দেখ দেখ, কেবা যেন আসিছে হেথায় ;
আকার প্রকার দেখি তোমারি মতন,
এও বুঝি কোথাকার দৈত্য একজন।"

নরাচল এবার চক্ষু মেলিল, তাহা দেখিয়া বামণগণ মৈ বাহিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। নরাচল উঠিয়া বসিল এবং অদূরে বজ্রবাহুকে দেখিতে পাইল। তখন সে ক্রোধে এমন হুঙ্কার করিল যে তাহাতে বামন রাজ্যের অনেকগুলি জেলার ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহাতে অনেক প্রাণহানি হইল ; অনেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হইল। নরাচলের খুব পাকা তাল-গাছের এক গাছি লাঠি ছিল, সে তাহা হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণ বজ্রবাহু তাহার সম্মুখীন হইলেন। দৈত্য অত্যন্ত ক্রোধে চক্ষু ঘূরাইয়া কহিল,—

"আমার রাজ্যেতে তুই কেরে, পাপাশয়,
নাহি কি, দুর্বৃত্ত, তোর মরণের ভয় ?"

বজ্রবাহু দৈত্য দানব অনেক দেখিয়াছিলেন, তিনি একটুও ভীত হইলেন না ; বরং তাঁহার আমোদ হইল, হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"ভাল, দৈত্য মহাশয়, এ রীতি কেমন—
অতিথিকে এইরূপে কর সম্ভাষণ ?
কে তোমা' বলিল আমি দুষ্ট দুরাচার
অত্যন্ত নিরীহ, সাধু প্রকৃতি আমার।

এ পথে কি কাহারও নাহি যাতায়াত
পথিক পেলেই তাকে কর কি নিপাত ?"

সে কথা কে শোনে ? বামনগণ যে বজ্রবাহুকে তাহার তুল্য মনে করিয়াছে, তাহাতেই নরাচলের অত্যন্ত অভিমান হইয়াছে ; বজ্রবাহুকে ভূমিসাৎ করিয়া সে তাহাদিগকে দেখাইবে যে তাহার তুল্য পৃথিবীতে আর কেহ নাই, মনে মনে এই সঙ্কল্প। সে আবার চীৎকার করিয়া কহিল,—

"নিদ্রাসুখে ছিনু আমি বহুদিন পর,
তুই আসি সে সুখেতে বঞ্চিলি, পামর।
পৃথিবীতে আর কোথা পথ বুঝি নাই
তাই এসেছিস্ হেথা—দাঁড়ারে, দেখাই।"

'দেখাই' বলিয়াই নরাচল তাহার তালগাছের লাঠি তুলিয়া বজ্রবাহুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিল। বজ্রবাহু গদা তুলিয়া সে আঘাত ফিরাইলেন ; কহিলেন,—

"বড় সাধ দেখিতেছি করিবারে রণ ;
দাঁড়াও, সমর সাধ মিটাব এখন।"

আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার বজ্রতুল্য গদা তুলিয়া নরাচলকে এমন ভীষণ তেজে আঘাত করিলেন যে, সে কাতর চীৎকারে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া ধরাশায়ী হইল। কিন্তু নরাচল ধরণী দেবীর পুত্র ; তাহার বর ছিল যে, সে শরীর দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেই তাহার বল দ্বিগুণ হইবে, মাটিতে পড়িয়া তাহার প্রাণ যাইবে না। বজ্রবাহুর আঘাতে সে মাটিতে পড়ি-

য়াই আবার দ্বিগুণবলে লাফাইয়া উঠিল; এবং লাঠি তুলিয়া বজ্রবাহুকে পুনরায় যথাশক্তি আঘাত করিল। কিন্তু লাঠি গাছটী বজ্রবাহুর গদায় পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তাহার কয়েক খণ্ড দূরস্থিত বামনগণের মধ্যে ছুটিয়া পড়িয়া অনেক শত লোকের প্রাণনাশ করিল। তখন তাহারা আরো দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। নরাচল গর্জ্জন করিতে করিতে কহিল,—"আয় মল্লযুদ্ধ করি।" বজ্রবাহু ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন,—

"যে যুদ্ধ তোমার ইচ্ছা যে প্রকার হয়,
কিছু কিছু জানা আছে সবই, মহাশয়।"

নরাচলের ভাবগতিক দেখিয়া বজ্রবাহু চিনিয়াছিলেন, এ নরাচল দৈত্য। তিনি তাহার কথা এবং তাহার অদ্ভুত বরের কথাও পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। হঠাৎ সে কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি তাহাকে বিনাশ করার উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। নরাচল যেই বন্যমহিষের মত মাথা নীচু করিয়া ও দুই হাত প্রসারিত করিয়া হু হু শব্দে তাহার প্রতি ছুটিয়া আসিল, অমনি বজ্রবাহু তাহাকে আপনার উরুর উপরে তুলিয়া লইলেন, আর দুইহাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ভন্ ভন্ করিয়া শূন্যে ঘুরাইতে লাগিলেন। নরাচলের মুখ ও নাক দিয়া তীরবেগে রক্ত ছুটিল। সে শূন্যে উঠিয়া আর মৃত্তিকাও স্পর্শ করিতে পারিল না; অতএব মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার শক্তি ও প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সে শূন্যে থাকিতে থাকিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। বজ্রবাহু তখন

তাহাকে ভূমিতলে ফেলিয়া দিলেন, দিতেই ধরিত্রীদেবী দ্বিখণ্ড হইয়া মৃত পুত্রের শরীরটী গ্রাস করিলেন।

তখন বামনরাজ্যে মহাশোকধ্বনি উত্থিত হইল। বামনেরা সকলে কান্দিয়া কহিতে লাগিল,—

"কোথা গেলে, নরাচল—ভাই নরাচল,
বামনের প্রিয়বন্ধু, রাজ্যের সম্বল।
রৌদ্র বৃষ্টি হতে রক্ষা কে আর করিবে,
কার সনে খেলা করি প্রাণ জুড়াইবে।"

বামনরাজ ঘোষণা দিয়া রাজবাটীতে মহতী সভা করিলেন। নরাচলের জন্য শোক প্রকাশ করা, তাহার হত্যাকারীকে কিরূপে শাস্তি দেওয়া যায় এবং রাজ্যের লুপ্ত গৌরব কিরূপে উদ্ধার হয় সভার এই বিবেচ্য। বামনপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রধান সেনাপতি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে জর্জ্জরিত হৃদয়ে কহিলেন,—

"হে বামনরাজ, ওহে বীর বন্ধুগণ,
আপনারা সকলেই করুণ শ্রবণ।
আমাদের প্রিয় ভ্রাতা দৈত্য নরাচল,
চিরবন্ধু, চিরসঙ্গী, গৌরবের স্থল,
স্বদেশের হিত হেতু আমাদেরো তরে
জীবন ত্যজেছে আজ অন্যায় সমরে।
বিশ্বময় বীরকীর্ত্তি করিয়া বিস্তার,
হাহাকারে ডুবাইয়া জগৎ সংসার,

পুণ্যতীর্থ করি ওই সমরের স্থল
স্বর্গধামে গেছে আজ বীর নরাচল।
দুঃখ নাই, এ মরণ নহেকো মরণ,
এরূপ মরণে লাভ অনন্ত জীবন।
হে বামন বীরগণ, মুছ অশ্রুজল
বৃথা শোকে করিওনা হৃদয় দুর্ব্বল।
অশ্রুজল মুছ, কিন্তু নয়ন যুগলে
ভীষণ ক্রোধের বহ্নি জ্বালরে সকলে!
প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা— প্রতিহিংসা চাই,
বান্ধ কটিবন্ধে অসি—চল রণে যাই!
ভ্রাতৃহত্যাকারী ওই দুষ্টের শোণিতে
ভ্রাতার তর্পণ করি প্রবোধিব চিতে!"

শুনিয়া তিন অঙ্গুলি, চারি অঙ্গুলি, পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত বামনবীরগণের হৃদয় ক্রোধে, উৎসাহে ও প্রতিহিংসা-বাসনায় পরিপূর্ণ হইল। তাহারা লম্ফ, ঝম্প ও বিকট সিংহনাদ করিতে লাগিল: তাহাদের সর্ষপ পরিমিত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; কোষ হইতে অসি নির্গত করিয়া, মস্তকোপরি ঘূর্ণিত করিতে করিতে তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই রণযাত্রার প্রার্থনা করিল। তখন সভা ভঙ্গ হইল; এবং অল্পকাল পরেই পঞ্চাশৎ সহস্র বামনসেনা সুসজ্জিত হইয়া বজ্রবাহুকে বধ করিবার জন্য রণযাত্রা করিল।

এদিকে পথশ্রমে ও যুদ্ধশ্রমে কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া বজ্রবাহু

রণস্থলেই শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। বামনবীরগণ তাঁহার অনতিদূরে ব্যূহ রচনা করিলেন। তখন এই তর্ক উপস্থিত হইল যে, নিদ্রিতাবস্থাতেই শত্রুকে আক্রমণ করা যায় কি তাহাকে জাগ্রত করা উচিত। কোন বীর কহিলেন,—

"এই দশাতেই একে করি আক্রমণ ;
ছলে, বলে,—কোন রূপে অরিবিনাশন।"

প্রধান সেনাপতি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণের সে অভিমত হইল না ; তিনি কহিলেন,—

"বীরধর্ম্ম নহে ইহা—নিরস্ত্র যে জন,
সুষুপ্ত যে জন তারে করি আক্রমণ।
শিশুও নাশিতে পারে নিদ্রিত কেশরী,
কি গৌরব কহ, বীর, হেন যুদ্ধ করি ?
আমি বলি রাজদূতে করহ প্রেরণ,
শত্রুকে সমরবার্ত্তা করুক জ্ঞাপন।"

তখন আজ্ঞাক্রমে দূত আসিল। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তাহাকে কহিলেন,—

"এই বার্ত্তা কহ গিয়া, দূত, বীরবরে
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তাকে ভেটিছে সমরে।
একাকী আমার সনে যুদ্ধ যদি চায়,
আসিতে কহিও, আমি প্রস্তুত হেথায়।
অথবা সসৈন্যে আমি সম্মুখ সমরে
প্রতিহিংসা মিটাইব বিনাশিয়া তারে।

রাজদূত একদল তূরী, ভেরী, ও ঢক্কাবাদ্যকর ও রাজপতাকা সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল। বাদ্যকরগণ বজ্রবাহুর কাণের নিকটে মহাশব্দে বাদ্য আরম্ভ করিল। দূত বাম হস্তে পতাকা ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কহিল,—

"শুন, বীর, সেনাপতি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ
তোমাকে সম্মুখ যুদ্ধে করেন আহ্বান।
একা যদি তাঁর সনে করিবে সমর,
প্রস্তুত আছেন তিনি, হও অগ্রসর;
আর যদি সেনাসনে যুদ্ধ ইচ্ছা হয়,
ত্বরা করি উঠে এস—বিলম্ব না সয়।"

কিন্তু কে উঠে? বজ্রবাহুর কর্ণে না বাদ্যধ্বনি, না দূতের চীৎকার প্রবেশ করিল। বহু চেষ্টাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া দূত সদলবলে ফিরিয়া আসিয়া সেনাপতিকে জানাইল—"শত্রুকে জাগাইতে পারিলাম না।" তখন অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া নিজেই অগ্রসর হইলেন। যাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাঁহার লোকেরা রাশি রাশি শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিয়া বজ্রবাহুর মস্তকের চতুর্দ্দিকে স্তূপাকার করিল এবং তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। যেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল, অমনি বামন বীরগণ এক সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার করিয়া বহু সহস্র তীর ছুড়িল। বজ্রবাহু এবার জাগিয়া উঠিয়া বসিলেন, চুলে আগুন লাগিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; আগুন নিবাইয়া ফেলিলেন; দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্ব শরীরে

হুল ফোটার মত কি সকল ফুটিয়াছে; সেগুলি ঝাড়িয়া ফেলিলেন। এই সময়ে মশার ভন্‌ভনানির মত শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তখন অধোমুখে প্রণিধান পূর্ব্বক চাহিয়া বামনগণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন; দুই অঙ্গুলির দ্বারা অতি সাবধানে সম্মুখস্থ একটী বামনকে আপনার বাম করতলে স্থাপন করিয়া আপনার চক্ষের নিকট ধরিয়া ইহার আকার প্রকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ঐ বামনের কথাও শুনিতে পাইলেন। বামন কহিতেছে,—

"রাজসেনাপতি আমি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ,
রাজাজ্ঞায়, বীর, তোমা' যুদ্ধ করি দান।
প্রবেশি বামন রাজ্যে বিনা অধিকারে
রাজ-মিত্র নরাচল, বধিয়াছ তারে,—
তুই রাজদ্রোহী—তুই দস্যু দুরাচার,
রাজাজ্ঞায় আজি তোরে করিব সংহার।
কি কাজ সসৈন্য যুদ্ধে? দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আয়,
ভূমিতলে নামায়ে দে আমাকে ত্বরায়;
শত্রুকরতলে, শূন্যে দাঁড়ায়ে, পামর,
কে কোথায়, শুনেছিস্, করেছে সমর?"

বজ্রবাহুর আর হাসি ধরে না; তিনি হো হো শব্দে হাসিয়া আকাশ প্রতিধ্বনিপূর্ণ করিতে লাগিলেন; তাহাতে কয়েক সহস্র বামন সেনা ভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল;

কেবল তাহাদের অধিপতিগণের তাড়নায় তাহা পারিল না। হাসির বেগ থামিলে বজ্রবাহু অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণকে কহিলেন,—

"যে তোমার দেহটুকু—কহ বীরবর,
ওর মাঝে কত বড় তোমার অন্তর ?"

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন,—

"যত বড়, বীরবর, তোমার হৃদয়
তার চেয়ে বড় হবে, কভু কম নয়।
স্বদেশের তরে, জ্ঞাতি, আশ্রিতের তরে
এ হৃদয় মৃত্যুভয় কখনো না করে।
এ হৃদয়ে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ সুকোমল,
দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা বিরাজে সকল।
গর্ব্বিত হয়ো না তব দেহের কারণে,
মানুষ মানুষ হয় হৃদয়ের গুণে।
বৃহৎ কি ক্ষুদ্র, শ্বেত, অসিত শরীর,
কেবল মাটীর বোঝা, জান না কি, বীর ?"

শুনিয়া বজ্রবাহু একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণের বীরত্বের ও হৃদয়ের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্যের জন্য তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হইল। তিনি তাহাকে সসম্ভ্রমে কহিলেন,—

"বীরবর, নরাচলে করেছি সংহার ;
সে দোষ আমার নহে—সে দোষ তাহার ;

সে আমাকে প্রথমেতে করে আক্রমণ,
শেষে আত্মরক্ষা হেতু করিয়াছি রণ।
যা হবার হয়েছে সে, শুন এবে ভাই,
আমি তোমাদের কাছে সন্ধি ভিক্ষা চাই।
আমি তোমাদের মিত্র যাবৎ জীবন,
তোমরা আমার সব ভাই বন্ধুগণ।"

ইহার পর বজ্রবাহুর সহিত বামনগণের সন্ধিস্থাপন হইল। তিনি দুই চারি দিন বামনরাজ্যে বাস করিয়া পুনরায় আপন কার্য্যে চলিলেন।

অনন্তর তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। এতক্ষণে তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি সমুদ্র পার হইবেন কিরূপে? তীরে গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে সমুদ্রের জলে অতি দূরে আকাশ-প্রান্তে একটী অতি উজ্জ্বল পদার্থ ভাসিতেছে। দ্রব্যটী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দেখিলেন যে উহা সোণার একটী প্রকাণ্ড গামলা। গামলাটী ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তীরে লাগিল। তাঁকে লইবার জন্যই যে আসিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব বজ্রবাহু কালবিলম্ব না করিয়া উহাতে উঠিয়া বসিলেন; গামলা অমনি সন্ সন্ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল। সূর্য্যের কিরণে উহা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, আর তিমি, মকর প্রভৃতি বড় বড় জলজন্তু ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। বজ্রবাহু এইরূপে বহু পথ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের ঠিক মধ্যস্থানে

অবস্থিত এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বীপে দুই অতি বৃহৎ পর্ব্বতের অতি উচ্চ দুই চূড়াতে দুই পা রাখিয়া নভশির দৈত্য আকাশ মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—

মহাকায় নভশির আকাশ মাথায়,
পদপ্রান্তে সাগরের তরঙ্গ খেলায়।
কটিদেশে মেঘমালা বিচিত্র বসন,
কটিতলে ঝড় বৃষ্টি হয় বরিষণ।
ঊর্দ্ধদেশ উজ্জ্বলিত অতুল বিভায়,
একত্রে সকল গ্রহ কর দেয় তায়।
দৈত্যের গভীর স্বর মেঘের গর্জ্জন,
নিশ্বাসেতে সৃষ্ট হয় ঘোর প্রভঞ্জন।
পদভরে কত দেশ মগ্ন হয়ে যায়,
অত্যুচ্চ ভূমেতে সিন্ধু-তরঙ্গ খেলায়।
এবে মাত্র অবশিষ্ট এই গিরিদ্বয়,
কে জানে কখন সিন্ধুতলে লয় হয়।

বজ্রবাহু যে পর্ব্বতে নভশিরের দক্ষিণ পদ ছিল, সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিলে দৈত্য অতি গভীরস্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিল,—"তুমি কে হে?

তুমি কে হে, বাপু? দেখি নরের আকার
কিন্তু মানুষের মত নহে ব্যবহার।
যে গদা তোমার হাতে, ইহার প্রহারে
এ আমার গিরিদ্বয় চূর্ণ হতে পারে।"

এতদূর বলিতে বলিতে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঘোর রবে মেঘ ডাকিতে লাগিল ; বজ্রবাহু নভশিরের মাঝের কথা কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কিছুকাল পরে যখন ঝড়বৃষ্টি থামিল, তখন তিনি শুনিলেন—

দৈত্য কহিতেছে,—

"তোমার আকার প্রায় আমার(ই) মতন
হেথা কি এসেছ বাপু, করিবারে রণ ?"

বজ্রবাহু কহিলেন,—

"আমি হে মানুষ, কিন্তু দৈত্য মহাশয়,
দৈত্য দানবের সঙ্গে সদা ভেট হয়।
এবে যুদ্ধ করিবারে নাহি অভিপ্রায়,
অন্য প্রয়োজনে, দৈত্য, এসেছি হেথায়।
বারুণী উদ্যানে ফলে দাড়িম্ব সোণার,
বহু শ্রমে আসিয়াছি সন্ধানে তাহার ;
নভশির, কি উপায়ে পাইব সে ফল,
কোন্ পথে যেতে হবে কহ তা' সকল।"

নভশির কহিল,—

"মহাশক্তি ধর দেহে, তবু তুমি নর,
বারুণী উদ্যানে যা(ও)য়া নরের দুষ্কর।
হেথায় অপেক্ষা যদি কর কিছুক্ষণ
এই আকাশের ভার করিয়া ধারণ,

আমি এনে দিতে পারি দানব-রাজার
বারুণী উদ্যান হতে দাড়িম্ব সোণার!"

বজ্রবাহু শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলেন। কথাটি সামান্য নহে; আকাশের ভার মাথায় বহিতে হইবে; আকাশটি তো আর ছোট খাট হাল্‌কা জিনিষ নহে? তিনি নভশিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"নরের দুষ্কর কেন বারুণীগমন,
আমাকে যে বাধা দেয় কে আছে এমন?"

নভশির উত্তর করিল,—

"লক্ষদন্ত অজগর উদ্যান দুয়ারে
সর্ব্বদা জাগ্রত থাকি রক্ষিছে উহারে;
কুপিত সহস্র নেত্রে যার পানে চায়
সে যদি মানুষ হয় ভস্ম হয়ে যায়।
কি ফল ফলিবে তথা শক্তিতে তোমার?
বিনা যুদ্ধে সে তোমারে করিবে সংহার।
দৈত্য দেহ ভস্ম করা তার সাধ্য নয়,
আমার সমরে তার হবে পরাজয়।
আমি আনি দিব তোমা দাড়িম্ব সোণার
ক্ষণেক ধরহ এই আকাশের ভার।"

অগত্যা বজ্রবাহু নভশিরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু এক মুস্কিল; নভশির বজ্রবাহু হইতে মাথায় অনেক উচু। বজ্রবাহু আকাশটি মাথায় লইলে উহা অনেক নীচু হইয়া পড়ে;

তাহাতে বিশ্বের কাজ কর্ম্মের অনেকটা অসুবিধা হয়; অনেক গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। বহু তর্কবিতর্ক হইয়া মীমাংসা হইল—

বজ্রবাহু দুই হাতে গদা উত্তোলিয়া
রাখিবে আকাশখানি তাহে ঠেকাইয়া।
তবে সে রহিবে নভঃ পূর্ব্বের মতন;
অবাধে করিবে গতি গ্রহতারাগণ।

নভশির আপনার মস্তক হইতে আকাশ সরাইয়া বজ্রবাহুর গদার অগ্রভাগে স্থাপন করিলেন; বজ্রবাহু পর্ব্বতের চূড়াতে দাঁড়াইয়া দুই হাতে গদা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। বহু লক্ষ বৎসর পরে মস্তক হইতে ভার নামাইয়া নভশিরের অত্যন্ত আরাম বোধ হইতে লাগিল। সে দুই চারি বার হাত পা ছুড়িল দুই চারি বার আপনার মাথায় হাত বুলাইল; পরে বজ্রবাহুর পদতলে আরাম পূর্ব্বক বসিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

নভশির বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া বজ্রবাহু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"কিহে দৈত্য নভশির, আর কতক্ষণ
বসে বসে ক্লান্তি দূর করিবে এমন?
গা' তুলনা, কেন বৃথা কর কালক্ষয়?
কার্য্যান্তে আরাম করো ইচ্ছা যত হয়।"

শুনিয়া নভশির কহিল,—

"করিলাম শ্রম কত লক্ষ বর্ষকাল,
দুদণ্ড বিশ্রাম করি তাতেও জঞ্জাল ?
অহে বজ্রবাহুবীর, প্রতিদিন আর
তোমা সম প্রতিনিধি হবে না আমার ;
ভাগ্যে যদি পাইয়াছি সুযোগ এমন,
হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি, ভাই, করোনা গঞ্জন।"

বজ্রবাহুর মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। আহা ! বেচারা এতকাল হইল এই আকাশের বোঝাটা বহিতেছে ; একটু বিশ্রাম করে করুক, আমার তাতে কিছু কষ্ট হয় তাও স্বীকার। এই ভাবিয়া বজ্রবাহু নীরবে আকাশ ধরিয়া রহিলেন। নভশির অতি আরামের সহিত উঠিয়া বসিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে সে অবশেষে উঠিয়া সমুদ্রের জলে নামিল ; প্রথমবার পা বাড়াইয়া শত যোজন অতিক্রম করিল, জল তাহার হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিল ; দ্বিতীয়বার পা বাড়াইয়া আর একশত যোজন গেলে জল তাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত উঠিল, তারপর আর একশত যোজন গেলে জল তাহার বুক পর্য্যন্ত উঠিল,—সমুদ্রের গভীরত্ব ইহা অপেক্ষা আর নাই।

বজ্রবাহু নভশিরের পথ চাহিয়া আছেন, কতক্ষণে সে আসিবে। তিনি তাঁহার ডান কাঁধে গদাটী খাড়া করিয়াছিলেন ; কাঁধে বেদনা ধরিয়া গিয়াছে। তাঁর একার সাধ্য নাই যে, তিনি গদা ডান কাঁধ হইতে বাঁ কাঁধে সরাইয়া লয়েন।

অবশেষে নভশির সোণার দাড়িম্ব লইয়া আসিতেছে দেখা গেল। সে আসিলে বজ্রবাহু তাহাকে কহিলেন,

"নভশির, ফলগুলি করি আহরণ
কৃতজ্ঞতাপাশে মোরে করিলে বন্ধন।
এবে ফিরে লও তব আকাশের ভার
আমাকে বিদায় দাও গৃহে যাইবার।"

নভশির কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। সে দাড়িম্ব ফলগুলি আকাশে দশ পনর যোজন ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া ফেলিয়া ও ধরিয়া খেলা করিতে লাগিল। বজ্রবাহু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কাঁধ নাড়া দিতেই ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া অনেকগুলি নক্ষত্র স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। পৃথিবীর লোকেরা ভীত হইয়া আকাশ পানে তাকাইল; তাহাদের ভয় হইতেছিল, পাছে সমস্ত আকাশটাই তাহাদের উপর পড়িয়া যায়! ইহাতে নভশির বজ্রবাহুকে কহিল,

"ক্রোধ কেন কর বীর, রহ কতক্ষণ,
অধীরের কার্য্যসিদ্ধি হয় না কখন।
কোটি যুগ বহিলাম আকাশের ভার,
শতেক বৎসর (ও) তুমি বহিবে না আর?
অনন্ত যৌবন হবে দাড়িম্ব ভক্ষণে,
ভুক্তিও সংসার-সুখ যত লয় মনে।
এবে কিছু শ্রম কষ্ট করিয়া স্বীকার
গরীব দৈত্যের, ভাই, কর উপকার।"

এই কথায় বজ্রবাহু একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু কাঁধে

যে আর সহে না ! তিনি চোখ মুখ ভার করিয়া আরো কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। নভশির আড়্‌চোখে আড়্‌চোখে ইহা দেখিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। অবশেষে সে কহিল,—

"বীর বজ্রবাহু, নহে বাসনা আমার,
অপরে অর্পণ করি নিজ কার্য্যভার।
বিশ্বধামে যে কার্য্যেতে যার নিয়োজন
তার (ই) তাহা সাজে ভাল—অন্যে বিড়ম্বন।
তুমি যাও কর গিয়ে কার্য্য আপনার—
দুষ্টের দমন আর আর্ত্তের উদ্ধার !
বহি আমি শিরোপরি বিশাল গগন,
যত দিন সৃষ্টি রহে—বিধির লিখন !"

তখন নভশির বজ্রবাহুর স্কন্ধ হইতে আকাশের ভার নিজ মস্তকে লইল ও তাঁহাকে সোণার দাড়িম্বগুলি দান করিল। বজ্রবাহু ফলগুলি পাইয়া নভশিরকে নমস্কার ও আলিঙ্গনান্তর আনন্দিত চিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

যে ফলের একটী দানা খাইলেও অনন্ত যৌবন ও অসীম শক্তি হয়, তাহার সবগুলিই যে বজ্রবাহু খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। দুই একটী অবশ্যই তাঁহার বংশধরগণের নিকট অদ্যাপি আছে। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, তোমরা যদি এক আধটা চাও, তবে বল আমাকে কি দিবে, আমি আনাইয়া দিতেছি।

মদিরা রাক্ষসী।

অতি পূর্ব্বকালের এক রাজপুত্রের কথা বলিতেছি, শুন। রাজপুত্রের নাম পরজিৎ; তাঁহার মাতার নাম প্রিয়ম্বদা। পরজিৎ যখন দুধের শিশু, তখন প্রিয়ম্বদার বিমাতা কতকগুলি দুষ্ট লোকের সাহায্যে, তাঁহাকে এবং তাঁহার শিশুকে একটা বড় ঝাঁপীতে পূরিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেয়। পাপিষ্ঠা গলা জলে দাঁড়াইয়া ঝাঁপীর গায়ে ঢেউ দিতে দিতে বলিল,—

"যারে ঝাঁপী ভেসে যা, মাঝ সাগরে ডুবে যা,
সতীনের ঝি শিশু নিয়ে আর যেন কুল পায় না;
মায়ে ছায়ে অতল জলে, মাছের পেটে হজম হ'লে,
চৌদ্দ সুখে থাব রব, আপদ বালাই রবে না;
যারে ঝাঁপী ভেসে যা, যারে ঝাঁপী ভেসে যা।"

ঝাঁপী ভাসিয়া চলিল। প্রিয়ম্বদা শিশুকে বুকে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড় বড় ঢেউ আসিয়া ঝাঁপীর গায়ে লাগিতে লাগিল; ঝাঁপী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল— এইবার বুঝি ফাটিয়া ডুবিয়া যায়। শিশু মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিল; তাহার দুঃখও নাই, ভয়ও নাই। রাজকুমারী সেই হাসি দেখিয়া আপন দুঃখ ও ভয় ভুলিয়া শিশুর মুখে শত শত চুম্বন করিলেন ও তাহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন।

এমন সময় তাঁহার বোধ হইল, যেন অতি বৃহৎ একটী জন্তু তাঁহাদিগকে ঝাঁপী সমেত পিঠে তুলিয়া লইল। তিনি শুনিলেন কে যেন জল মধ্য হইতে কহিল,—

"রাজকুমারী প্রিয়ম্বদে, কোন ভয় করোনা আর,
স্থির হয়ে গো বসে থাক নিয়ে যাব সাগর-পার।"

শুনিয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন,—

"দুখিনীর দুখে দুখী কে গো তুমি, মহাশয়,
কে এত করিলে দয়া দেহ মোরে পরিচয়।"

এ প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না। যাহা হউক, প্রিয়ম্বদা শিশুটীকে কোলে লইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। ঝাঁপী খুব দ্রুতবেগে সাগরের জল কাটিয়া ছুটিল। এইরূপ দিনের পর দিন, বহুদিন অতীত হইলে উহা সমুদ্রমধ্যস্থ নাল নামক এক অতি মনোহর দ্বীপে উপস্থিত হইল। প্রিয়ম্বদা তখন শিশুটীকে লইয়া ঝাঁপী হইতে বাহির হইয়া বালুর উপরে বসিলেন। ক্ষণকাল পরে এক ধীবর মাছ মারিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। সে একটা বড় ঝাঁপীর নিকটে একটি পরমাসুন্দরী রমণী ও তাঁহার অতি সুন্দর শিশুটীকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইল। রাজকন্যা আত্ম-পরিচয় দিলেন,—

"আমি রাজকন্যা পিতঃ, প্রিয়ম্বদা নাম,
ঘরে যে বিমাতা আছে তিনি মোরে বাম।

এই পুত্র সহ মোরে বিনাশিবে ব'লে,
ভাসাইয়া দিয়াছিল সাগরের জলে।
ভাসিতে ভাসিতে হেথা এসেছি এখন,
দয়া করি আমা' দোহে বাঁচাও সুজন।"

শুনিয়া ধীবর কহিল, "তোমার শিশুটীকে লইয়া আমার গৃহে আইস ; আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রকে অতি যত্নে পালন করিব।" প্রিয়ম্বদা ধীবরের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গেলেন। ঐ ধীবর সামান্য ধীবর নহেন। তিনি ঐ দ্বীপের রাজা পুরদক্ষের ভ্রাতা। ইনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও দয়াপরায়ণ ; ভ্রাতা পুরদক্ষের অসৎ ব্যবহারে ও পাপাশয়তায় বিরক্ত হইয়া দ্বীপের এক কোণে সামান্যভাবে বাস করিতেছেন। ইনি প্রিয়ম্বদা ও পরজিৎকে অতি আদরে গ্রহণ করিলেন ও পালন করিতে লাগিলেন। পরজিতের বিদ্যা শিক্ষার কাল উপস্থিত হইলে ধীবর অতি যত্নে তাহাকে নানা শাস্ত্র ও নানা প্রকার যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন।

পরজিৎ এখন অতি সুন্দর যুবা পুরুষ হইয়াছেন ; তাঁহার শরীরে অপরিসীম শক্তি, তাঁহার যুদ্ধকৌশল অতুলনীয়। সমস্ত নীল দ্বীপে তাঁহার যশঃ বিস্তার হইল। পুরদক্ষ তাঁহার ও তাঁহার মাতার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ ধীবর অতি দুঃখে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন ; প্রিয়ম্বদাকে কহিলেন,—

"পুরদক্ষ পাপমতি কখন কি করে,
সাবধানে রহিও, মা, রাজার গোচরে।"

পরজিতের ললাটচুম্বন ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"সত্য পথে অবিচল, সত্যধর্ম্ম, সত্যবল,
চিরদিন রহিবে কুমার ;
দুষ্ট দমনের তরে শিষ্টে রক্ষা করিবারে,
নিজ শক্তি কর ব্যবহার।"

পরজিৎ মাতার সহিত রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, পুরদক্ষ তাঁহাদের বাসের জন্য রাজবাটীতে স্থান দিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে রহিলেন। রাজপুত্র আপনার রূপ, বিদ্যা ও যুদ্ধ-নৈপুণ্যে সকলকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। রাজধানীর সকল লোকে তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। ইহাতে পুরদক্ষের অত্যন্ত ঈর্ষ্যা হইল ; কেন না, কেহই তাঁহার আপন পুত্রের প্রশংসা করে না। সকলেই বলে, "আমাদের রাজপুত্র পরজিতের পদলেহন করিবারও উপযুক্ত নহে।" তখন পিতা, পুত্র এবং কয়েকজন কুমন্ত্রী একত্র হইয়া পরজিৎ ও তাঁহার মাতার বিনাশের সংকল্প করিল। বহু মন্ত্রণার পর উপায় স্থির হইল। পুরদক্ষ পরজিৎকে ডাকাইয়া কল্পিত স্নেহের স্বরে কহিলেন—"আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে বহু যত্নে পালন করিয়াছেন আমিও যথাসাধ্য তোমাদের উপকার করিয়াছি ও করিব ইচ্ছা করি। তোমার এখন বয়স হইয়াছে, তুমি বিদ্বান্ ও শক্তিমান হইয়াছ ; আমার বোধ হয়, তুমি এখন ইচ্ছা কর যে, তুমি আমাদের এই উপকারের যথাশক্তি প্রতিদান কর।"

রাজপুত্র বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন—"মহারাজ, প্রাণপাতেও যদি আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তবে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।"

রাজা অত্যন্ত আহ্লাদের ভাণ করিয়া কহিলেন—"তোমার উপযুক্ত উত্তরই তুমি করিয়াছ;

যেমন সুরূপ, বিদ্যা, শক্তি যে প্রকার,
হৃদয়ের মহত্বও তেমনি তোমার;
দীর্ঘজীবী হ'য়ে সুখে থাকহ, কুমার,
রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি কর অনিবার।"

তার পর কহিলেন,—"পরজিৎ, আমি মালদ্বীপের রাজকন্যা ঊষাবতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু ঊষাবতীর পিতা পণ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মদিরা নাম্নী রাক্ষসীর মস্তক কাটিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই কন্যাদান করিবেন, অন্য কাহাকেও নহে। আমি নিজে ঐ রাক্ষসীর সন্ধানে গেলে রাজকার্য্যের অত্যন্ত হানি হয়। এই জন্য তোমাকে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। তুমি ব্যতীত ঐ পরাক্রান্ত রাক্ষসীকে বধ করিতে পারে, এমন বীর আমার রাজ্যে আর কেহ নাই। আর দেখ, রাজপুত্র, তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, তাই তোমাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তোমার যশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। মদিরা রাক্ষসীকে বিনাশ করিলে, তুমি অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিবে। অতএব,

সত্বর হও; কাল বিলম্ব করিও না।” পরজিৎ কহিলেন,—“মহারাজ, আমি কল্যই রাক্ষসীর সন্ধানে যাত্রা করিব।

লইব বিদায় মাত্র চরণে মাতার,
গলেতে পরিব চর্ম্ম হস্তে তরবার।
রাক্ষসী যথায়(ই) রহে করিব সন্ধান,
জীবনপণেও তার নাশিব পরাণ।”

রাজা কহিলেন,—“দেখ, যেন মাথাটি বেশ সাবধানে কাটিও; নাক, চোক, কাণ ইত্যাদি কোন অঙ্গ নষ্ট না হয়। এক আঘাতে গলাটী কাটিতে হইবে, নতুবা রাক্ষসী বিনষ্ট হইবে না।”

পরজিৎ যৌবন ও আপন বাহুবলের গর্ব্বে মদিরা রাক্ষসীকে বধ করিবার ভারগ্রহণ করিলেন, একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না, মদিরা কি ভীষণ জীব। তিনি রাজার সাক্ষাৎকার হইতে চলিয়া যাওয়া মাত্র রাজা, তাঁহার পুত্র ও দুষ্ট মন্ত্রিগণ হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল। ঈর্ষ্যান্বিত পুরদক্ষ কহিলেন,—“এইবার বাছাধনের বীরত্ব দেখা যাবে। মদিরা যেমন তেমন রাক্ষসী নহে—

তিন ভগ্নী রাক্ষসীরা সংযুক্ত শরীর,
ছয় হস্ত, ছয় দীর্ঘ পুচ্ছ, তিন শির;
লৌহেতে নির্ম্মিত দেহ পিত্তলে মস্তক
ছয়টী সোণার পাখা করে ঝকমক;

মদিরা রাক্ষসী।

যে জীব তাদের প্রতি বারেক তাকায়
তিলেকে তাহার দেহ শিলা হয়ে যায়।
শিরে কেশ নহে,—সর্প হাজার হাজার,
বিষধর, ভীমকায়, গর্জ্জে অনিবার।
নিম্নাঙ্গ মৎস্যের প্রায়, মধ্যাঙ্গ পক্ষীর,
স্ত্রীলোকের প্রায় বক্ষ, কুগঠন শির।
মধ্যস্থলে মদি, তার দু'পাশে দু'জন
একত্রে আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, চরণ।

যাদুর আর দেশে ফিরিতে হইবে না। হয় রাক্ষসীদের মাথার সাপের কামড়ে কিম্বা লোহার হাতের চাপড়ে প্রাণ বাহির হইবে, না হয় তাহাদের প্রতি তাকাইয়া পাথরের মূর্ত্তি হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। দুর্ব্বৃত্তকে দূর করিবার বেশ উপায় হইয়াছে, কি বল হে ? তার পর ওর মা মাগীকে সরান যাবে, হো ! হো ! হো !" মন্ত্রীরা সকলে রাজার কথায় "আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ" বলিয়া আরো অধিক উচ্চরবে হাসিতে লাগিল।

তোমরা বুঝিলে তো পরজিৎ কি শঙ্কটের কাজেই হস্তক্ষেপ করিলেন ? প্রথমতঃ রাক্ষসীরা যে কোথায় থাকে, তাহারই স্থিরতা নাই ; অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে—কেইবা তাহা বলিতে পারিবে ? তারপর রাক্ষসীরা সমুদ্রের অগাধজলে, উচ্চ আকাশে, কখনো বা স্থলে বিচরণ করে ; পরজিৎ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আকাশে ও জলের নীচে কিরূপে যাইবেন ? রাক্ষসীরা ভয়ানক বিক্রমশালিনী ; যাহুর আঘাতে শত শত বীরকে ধরাশায়ী

করিতে পারে; একবার মুখব্যাদন করিয়া শত শত জীব গ্রাস করিতে পারে। তাহাদের লৌহের শরীরে ও পিত্তলের মস্তকে সামান্য অস্ত্র শস্ত্র বিদ্ধ হয় না। তাহাদের মাথার হাজার হাজার বিষধর সর্প সর্ব্বদা ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে এবং তাহাদের মুখ ও চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ হইতেছে, কার সাধ্য নিকটে যায়? তাহারা দংশন করিলে তো তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। কিন্তু এসকল অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এই যে, তাহাদের স্বর্ণ-নির্ম্মিত পক্ষগুলির আভায় দশদিক আলোকিত হয়; যদি কেহ বিমোহিত হইয়া তিলেক মাত্রও তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করে, সে তৎক্ষণাৎ পাষাণমূর্ত্তি হইয়া পড়িয়া থাকে। যে শত্রুর প্রতি দৃষ্টি করাও যায় না, তাহাকে পরজিৎ কিরূপে আঘাত করিবেন ও বধ করিবেন? আবার আর কাহাকেও নহে, দুই পাশের দুই ভগিনী ফেলিয়া মধ্যস্থিতা মদিরার মস্তকটী কাটিয়া আনিতে হইবে। রাজা বলিয়াছেন, "দেখ যেন নাক, চোক, কাণ ইত্যাদি কোন অঙ্গ নষ্ট না হয়; সাবধানে কাটিও"; এও কি সম্ভবে? কি দুরূহ কাজেই পরজিৎ না বুঝিয়া হাত দিলেন? যাহা হউক তিনি মায়ের নিকট যাইয়া বলিলেন,—

"রাক্ষসী নাশিতে দূরে যাব রাজাজ্ঞায়,
আশীর্ব্বাদ করি পুত্রে দেহ, মা, বিদায়।"

প্রিয়ম্বদা বীরপত্নী ও বীরমাতা; তিনি ভীতা হইয়া পুত্রকে বাধা দিলেন না; সামান্যা স্ত্রীলোকের মত কান্দিতে বসিলেন না। বলিলেন,—

"অসুর রাক্ষস আদি দুর্জ্জয়, ভীষণ,
করো তাহাদের সনে সাবধানে রণ ;
দুখিনী মাতার শুধু তুমিই সম্বল,
তোমার হবে না, বাছা, কভু অমঙ্গল।"

পরজিৎ মাতাকে প্রণাম করিয়া, কটিতে তরবারি ও বক্ষে ঢাল বান্ধিয়া বহির্গত হইলেন। শেষে সমুদ্র পার হইয়া, এক মহাদেশে পঁহুছিলেন। তিনি চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, —কোথায় যাই ? রাক্ষসীরা কোথায় আছে আমায় কে বলিয়া দিবে ? আর সন্ধান পাইলেই বা কিরূপে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব ? ফলকথা, রাক্ষসীদের আকৃতি ও বিক্রমের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন বিষণ্ণ হইতে লাগিল। বলদর্পে বা লজ্জায় রাজার সাক্ষাতে ও মায়ের সাক্ষাতে কিছু বলেন নাই, এখন একা যাইতে যাইতে বুঝিতে লাগিলেন বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

এক অতি বিস্তৃত বনের ভিতরে এক খানি পাথরের উপরে বসিয়া তিনি গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন 'কি করি !' পশ্চাৎ হইতে কে প্রফুল্ল স্বরে উত্তর করিল,—

"কি করি ! একথা কেন ? কেন বা কাতর ?
উঠহ, কর্ত্তব্য-পথে হও অগ্রসর।"

রাজকুমার বিস্মিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন—এক অতি দিব্য যুবা পুরুষ ; তাঁহার কটিদেশে একখানি ক্ষুদ্র বক্র তরবারি, হাতে একখানি যষ্টি, তাহাতে যেন দুইটা সোণার জীবিত

সর্প জড়িত ; সর্প দুইটী বড় সুন্দর ; যষ্টির মাথায় দু'খানি ক্ষুদ্র পাখা। যুবকের মাথায় একটী মনোহর উষ্ণীষ, তাহার দু'পাশেও ক্ষুদ্র দু'খানি পাখার মত। তাঁহার ভাব এমন আনন্দময় এবং স্বর এমন মিষ্ট ও প্রফুল্লতাব্যঞ্জক যে পরন্তিতের বিষণ্ণ মনেও মুহূর্ত্ত মধ্যে আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি যে ভীরুর মত বিষণ্ণভাবে বসিয়াছিলেন, আগন্তুক তাহা দেখিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারি একটু লজ্জাও হইল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আমি কাতর নহি ; একটা বড় সঙ্কটাপন্ন কাজে হাত দিয়াছি, তাই ভাবিতেছিলাম। আপনার নাম কি, মহাশয় ?" যুবা উত্তর করিলেন,—

"যা বলে ডাকিবে, ভাই, সেই নাম সায়,
মানুষ নামেতে নয়, কাজে চেনা যায়।
আমার চঞ্চল গতি সদা সর্ব্বক্ষণ,
চাহ ত 'চঞ্চল' ব'লে করো সম্বোধন।

যা হোক, তোমার সঙ্কটাপন্ন কাজটী কি ? আমি কি শুনিতে পাই না ? কাজ যাই হোক্, একা করিতে যত আয়াস হইবে, দু'জনে মিলিয়া করিলে তত হইবে না।"

রাজকুমার আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ; শেষে কহিলেন,—

"মৃত্যুতে নাহিক ভয়, এই ভয় পাই
রাক্ষসীর পানে চেয়ে শিলা হয়ে যাই।"

চঞ্চল হাসিয়া কহিলেন—"তা, তুমি যে সুন্দর যুবা পুরুষটী, সাদা পাথরের মূর্ত্তি হয়ে যাও ত মহামূল্য জিনিস হবে। কিন্তু

অত সব ভয় করিবার এখনই প্রয়োজন কি? যদি রাক্ষসীতো আর অমর নয়, তোমার হাতেই যে সে মরিবে না, তাহারই বা স্থিরতা কি? আমি তোমাকে এ বিষয়ে খুব সাহায্য করিতে পারিব; আমার ভগিনীও পারিবেন। পরজিৎ কহিলেন—"তোমার ভগিনী? তোমার আবার ভগিনী আছে নাকি?" চঞ্চল উত্তর করিলেন—"কেন? আমাদের কি আর ভগিনী থাকিতে নাই? আমার ভগিনী বড় গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বড় বুদ্ধিমতী। তিনি কখনও হাসেন না, গভীর নীতির কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন না; তাঁর চঞ্চলতা মাত্র নাই—আমি তাঁর ঠিক বিপরীত।" রাজপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"বাপ্‌রে, তাঁহার সঙ্গে যে আমার কথা কহিতেই ভয় হবে!" কিছুকাল পরে চঞ্চল কহিলেন—"তবে এস, এখন কার্য্য আরম্ভ করা যাক্। প্রথমে তোমার ঐ ঢালখানি মাজ—এমন পরিষ্কার করিবে যেন উহাতে আয়নার মত মুখ দেখা যায়।" পরজিৎ তাহাই করিতে লাগিলেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'ঢালকে আয়নার মত করিয়া যে কি হইবে, তাতো বুঝিতে পারিতেছি না; যা হোক্, চঞ্চল সে সব আমা হ'তে ভাল জানে—যা বলে করি।' ঢাল পরিষ্কার হইলে চঞ্চল কটিবন্ধ হইতে আপনার ক্ষুদ্র বক্র তরবারি খানি পরজিতের কটিতে পরাইয়া দিলেন এবং তার তরবারি খানি খুলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—"মদিরা রাক্ষসীকে মারিবার উপযুক্ত এমন তরবারি আর নাই।" তার পর চঞ্চল আবার বলিলেন—"চল রাজকুমার, এখন্ সুধূম্রাদের সন্ধানে যাই।" পরজিৎ আশ্চর্য্যা-

ন্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"সুধূম্রা ? তাহারা কে ? তাদের সন্ধানে গিয়ে কি হবে ? চল না রাক্ষসীদের সন্ধানে যাই। কালগৌণের প্রয়োজন কি ?" চঞ্চল উত্তর করিলেন—"সুধূম্রাদিগকে না পাইলে রাক্ষসীদের সন্ধান পাবে কার কাছে ? সুধূম্রারা—

তিন বৃদ্ধা নারীরূপা, কিন্তু নারী নয়,
দিবালোকে চন্দ্রালোকে নাহি দৃষ্ট হয়।
নক্ষত্র আলোকে কিম্বা সন্ধ্যার আঁধারে
তা'দিগে ধরার জীব দেখিবারে পারে।
প্রত্যেকের ললাটেতে একটী কোটর,
পালাক্রমে রাখে নেত্র তাহার ভিতর।
যাহার কোটরে নেত্র রহে যে সময়,
সে দেখিতে পায়—অন্য দোঁহে অন্ধ রয়।
বড় ভয়ানক জীব এই তিন জন,
পড়িলে তাদের হাতে সংশয় জীবন।

কিন্তু তবুও এদের নিকট যাইতে হইবে এবং ছলে হোক্, বলে হোক্, এদের নিকট হইতে যদি রাক্ষসীদের সন্ধান ও বধের উপায় জানিতে হইবে।"

তখন দুইজনে যাত্রা করিলেন। প্রথমে চঞ্চল ও পরজিৎ পাশাপাশি ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই রাজপুত্র বহু পশ্চাতে পড়িয়া গেলেন। চঞ্চল হাঁটেন কি উড়েন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার বোধ হয় যেন চঞ্চলের পা মাটি ছোঁয় না ; তাঁহার হাতের যষ্টি গাছি ও মাথার উষ্ণীষটি যেন পাখা মেলিয়া তাঁহাকে

তীরবেগে বায়ুর ভিতর দিয়া লইয়া যায়। বহুদূর যাইয়া চঞ্চল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, পরজিৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পঁহুছিলে মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন—"কি হে রাজকুমার, তোমাদের দেশে সকলেই তোমার মত দ্রুত চলে নাকি?" রাজকুমার চঞ্চলের যষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন--"আমার মতন বই কি?

তোমার উষ্ণীষ আর যষ্টি যদি পাই,
আমিও তোমার মত বায়ুগতি যাই।

হ্যাঁ ভাই, তোমার টুপিটা ও লাঠি গাছটীর পাখা আছে বলে যেন বোধ হয়, তোমাকে যেন উড়াইয়া লইয়া যায়; অথচ নিকট দৃষ্টিতে কিছু দেখিতে পাই না।"

চঞ্চল হাসিয়া বলিলেন—"হবে; তুমি আমার এই লাঠি গাছটী লও, ইহার সাহায্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিবে বোধ হয়।" পরজিৎ লাঠি গাছটী লইলেন, অমনি তাঁহার সমস্ত শরীর যেন বায়ুর মত লঘু হইল। দুই জনে তীরবেগে যাইতে লাগিলেন, অথচ একটুও ক্লান্তি কি অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল না। দুইজনে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে যাইতেছেন। চঞ্চলের প্রতি পরজিতের খুব ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিয়াছে।

বহুক্ষণ এইরূপে গমনের পর তাঁহারা অল্প অল্প জঙ্গল বিশিষ্ট এক বিস্তৃত জলাভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। অল্প অল্প অন্ধকার;

জন মানবের বাস নাহিকো তথায়,
সদা শুধু হিংস্র পশু চরিয়া বেড়ায়।

পেঁচার কর্কশ ধ্বনি, ভেকের চীৎকার,
শিবার কুরব কর্ণে পশে অনিবার।
আলেয়া, ভূতের অগ্নি, জ্বলে, নিবে যায়,
অতি বেগে বহিতেছে পুতিগন্ধ বায়।

চঞ্চল পরজিতের গা টিপিয়া চুপি চুপি কহিলেন—"আস্তে ; আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়াছি। সুধূম্রারা এই খানে আছে। এখন সাবধান, দেখো যেন তারা তোমাকে প্রথমে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে শেষ করিয়া ফেলিবে। যদিও তাদের তিনজনের মধ্যে একটী চক্ষু, তবু সেই একটি সাধারণ চক্ষুর জ্যোতি এক শতটীর সমান ; কপালে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, তৃণ গাছটী পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছে। যা বলি শুন, এক বুড়ী আপনার ললাটের কোটরে চক্ষুটী বসাইয়া চারিদিকে দেখে, তখন অন্য দুটী অন্ধ হইয়া থাকে ; পরে সে যখন চক্ষুটী খুলিয়া হাতে লইয়া অন্য বুড়ীকে দিতে যায়, তখন মুহূর্ত্তের জন্য তিনজনেই অন্ধ হয়, কেন না কোটরে না বসিলে সে চক্ষু দ্বারা দেখা চলে না। তুমি এই ঝোপের ভিতরে লুকাইয়া থাক, আমিও রহিব। যেই এক বুড়ী চক্ষু হাতে লইয়া অন্যাকে দিতে যাইবে, অমনি ছোঁ মারিয়া উহা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িবে ; তার পর যা করিতে হয় বলিব।"

তখন দুজনে ঝোপের আড়ালে বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরেই তিনটী বিকটাকার, অতিবৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত জীব তাঁহাদের দিকে আসিতেছে, তাঁহারা দেখিলেন ; দেখিলেন,—

সুধন্বারা তিন বোন্

রক্ত মাংস আছে দেহে নাহি মনে লয়,
রাশি রাশি চর্ম্ম শুধু ঝোলে দেহময়।
অতি শীর্ণ হস্ত পদ কঙ্কাল আকার,
ধূম্রবর্ণ দেহ, শিরে শ্বেত কেশ ভার।

তখন সর্ব্বজ্যেষ্ঠার ললাট-কোটরে চক্ষুটী জ্বলিতেছিল; সে চক্ষুর কি তেজ! রাজপুত্রের বোধ হইতে লাগিল যেন গুল্মাবরণ ভেদ করিয়া সে চক্ষু তাঁহাদিগকে দেখিতেছে। তখন মধ্যমা সুধূম্রা কহিল—"চোখটা একবার দেওতা গা, চারিদিকটা দেখে নেই; কেমন যেন নূতন জানোয়ারের গন্ধ পাচ্ছি।" এই বলিয়া সে নাক উচু করিয়া নিশ্বাস টানিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা কহিল—"রসো না আর একটু; আমি কি আর চারিদিক দেখ্তে পাচ্ছি না? যা দেখবার হয় আমিই দেখ্ছি!" মধ্যমা রাগ হইয়া কহিল—"তুমি আর কতক্ষণ রাখ্বে চোখ? তুমি কি এখন নিয়েছ? বড় স্বার্থপর বা হোক্।" তখন কনিষ্ঠাও কহিল—"তোমারা দুইজনেই পালা করে চোখ নিয়ে ছাখ, আমি যেন আর কেউ নই; চোখ তোমরা কেউ পাবে না—এবার চোখ আমার।" জ্যেষ্ঠা সুধূম্রা রাগ করিয়া চোখটা খুলিয়া হাতে লইল। তখন তিন জনেই অন্ধ। জ্যেষ্ঠা কহিল—"যার খুসি ভাই, চোখ নাও, আমি কারুকেই দিচ্ছিনা।" তখন মধ্যমা হাত বাড়াইয়া জ্যেষ্ঠার হাত খুঁজিতে লাগিল, কনিষ্ঠাও হাত বাড়াইয়া জ্যেষ্ঠার হাত খুঁজিতে লাগিল। মধ্যমা কনিষ্ঠার হাত ধরিতে পারিয়া খুব জোরে মুচ্ড়াইয়া দিল; কনিষ্ঠাও ছাড়িল না;

আর তিন জনে মিলিয়া ভয়ানক কলহ করিতে লাগিল। চঞ্চল পরজিৎকে চুপি চুপি কহিলেন—“এই সময়।” রাজপুত্র চকিতের মত এক লম্ফে ঝোপ পার হইয়া, জ্যেষ্ঠা সুধূম্রার হাত হইতে চক্ষুটী কাড়িয়া লইলেন; লইয়া তুইজনে অনেক দূর সরিয়া পড়িলেন। সুধূম্রারা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না। জ্যেষ্ঠা মনে করিল, তার দুই বোনের এক জনে নিয়েছে; জিজ্ঞাসা করিল—“কে নিলে গা?” মধ্যমা কহিল “কই আমি নেই নাই।” কনিষ্ঠাও কহিল—‘আমিও নেই নাই।’ কেহ কাহারও কথা বিশ্বাস করিল না। জ্যেষ্ঠা ভাবিল, ভগিনীরা দুই জনেই মিথ্যা কহিতেছে। কহিল,—

“কি বালাই, কি বালাই,
নিয়ে বলে নেই নাই।”

মধ্যমা রাগিয়া চীৎকার করিয়া কহিল,—

“ও বুড়ী পোড়ারমুখী,
আমাদেরে দিবি ফাঁকি;
নখরে চিরিব বুক,
তবে সে মিটিবে দুখ!”

কনিষ্ঠাও তাতে যোগ দিল,—

“দাঁতে কাটি নাক কাণ,
তবে সে জুড়ায় প্রাণ!”

মধ্যমা কনিষ্ঠার দিকে ফিরিয়া কহিল,—

“তোরি নাকি দুষ্টপনা?”

কনিষ্ঠা রাগিয়া উত্তর করিল,—

"কখনো না কখনো না !
এমন কহিবি আর,
পিষিয়া ফেলিব হাড়।"

তিন জনে এইরূপে মহা কলহ করিতে লাগিল। তাহাদের পৈশাচিক চীৎকারে ভেক, পেচক, শৃগাল ইত্যাদিরাও ভয়ে চুপ করিয়া রহিল, বনের পশুগণ আপন আপন আবাসে যাইয়া লুক্কায়িত হইল। তখন চঞ্চলের উপদেশ মত পরজিৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"স্বধূম্রাগণ, তোমরা পরস্পরে বৃথা কোন্দল করিতেছ: তোমাদের চক্ষুটী আমার নিকটে—এই আমি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছি।" শুনিয়া স্বধূম্রাগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া একত্রে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—

"কে তুই মানুষ জীব, আস্পর্দ্ধা এমন—
আমাদের সঙ্গে ব্যঙ্গ শত্রু আচরণ।

পরজিৎ নম্রভাবে কহিলেন—"আমি তোমাদের চক্ষুটী চাহি না, ক্ষণকালের জন্য রাখিয়াছি মাত্র। আমাকে বল, মদি রাক্ষসীরা কোথায় আছে, আর কিরূপে মদিকে বধ করা যাইতে পারে, তবে তোমাদের চক্ষু ফেরত দিই; আর না বল তো চক্ষুটী এখনি নষ্ট করিয়া ফেলি আর কাল-ভৈরবকে ডাকি।" এই কথা বলিবামাত্র স্বধূম্রারা শিহরিয়া উঠিল—

"বাপ্‌রে, বাপ্‌রে! নর, ডেকোনা তাহায়,
বিনষ্ট করোনা চক্ষু, বলিব তোমায়

কি উপায়ে রাক্ষসীর হইবে নিধন
কি ভাবে কোথায় তারা রয়েছে এখন।”

জ্যেষ্ঠা সুধূম্রা মদি রাক্ষসীদের আবাসস্থান এবং কোন্ পথে তথায় যাইতে হইবে, সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিল,—“মানুষ, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যার নাম করিলে তাকে ডেকো না; আমি তোমাকে মদি রাক্ষসী বধের উপায় বলিয়া দিতেছি;—

“অলকা দেবীর বাস গন্ধর্ব্বকাননে,
তাঁহার নিকটে যাও ত্বরিত গমনে।
সোপচারে দেবীর করিয়া আরাধন,
প্রসন্না হইলে, ভিক্ষা চাহিও এমন—
“দেহ পক্ষদ্বয় দেবি, দেহ গো উষ্ণীষ
‘মদি নাশ কর’ এই করহ আশীষ।”
অলকা করেন যদি প্রার্থনা সফল
পূরিবে, মানব, তব বাসনা সকল।”

পরজিৎ তখন চঞ্চলের ইঙ্গিত অনুসারে মধ্যমা সুধূম্রার হস্তে চক্ষুটী ফেলিয়া দিয়া যষ্টির সাহায্যে নিমেষ মধ্যে বহুদূর চলিয়া আসিলেন; চঞ্চল তাঁহার পার্শ্বেই আছেন। তাঁহারা তদ্দূর হইতেও শুনিতে লাগিলেন, সুধূম্রারা চক্ষু লইয়া কোন্দল করি- করিতেছে; এ বলে ‘আমায় দে’ ও বলে ‘আমায় দে।’

বহুদিন চলিতে চলিতে তাঁহারা অবশেষে গন্ধর্ব্বকাননে উপনীত হইলেন। কি সুললিত পুষ্পবন!—

তরুগুল্মলতারাজি, নানা ফুলে আছে সাজি,
সুরভি সুশীত' বায়ু বয় ;
কলকণ্ঠ পক্ষিগণ সুখে করে আলাপন
গুঞ্জরিছে মধুমক্ষিচয়।
বাসন্তি রবির করে, নবদুর্ব্বা শয্যা'পরে,
বিরাম লভিছে পশুগণ,
চিত্রিত পতঙ্গরাশি, আলোক সাগরে ভাসি,
করিতেছে সুখে সন্তরণ।

চঞ্চল কহিলেন—"রাজপুত্র, তুমি এই সরোবর তীরে বসিয়া দেবীর আরাধনা কর, আমি এক বার এদিক সেদিক দেখি।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরজিৎ দেবীর আরাধনায় বসিলেন। ফুল, ফল দিয়া কতক্ষণ পূজা ও ধ্যান করার পর অলকা দেবী প্রসন্না হইয়া পূজকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন,—

"তোমাতে প্রসন্না আমি, শুন বাছাধন,
কি কামনা করিয়াছ কর নিবেদন।"

রাজপুত্র দেখিলেন, দেবী পরমাসুন্দরী, তাঁহার প্রভায় সূর্য্যের আলোকও মলিন হইতেছে। তিনি যোড় হস্তে কহিলেন,—

"দেহ পক্ষদ্বয় দেবি, দেহ দেহ গো উষ্ণীষ,
'মদি নাশ কর' এই করহ আশীষ।"

দেবী রাজপুত্রের হাতে একটী ফল দিয়া কহিলেন,—"তুমি এই সরোবর জলে স্নান করিয়া এই ফল ভক্ষণ কর, ইহাতে তোমার শরীরে অসীম শক্তি হইবে।" পরজিৎ সরোবর-জলে

স্নান করিয়া সেই ফল খাইলেন। কি মিষ্ট ফল, যেন অমৃত! খাওয়া মাত্রেই তাঁর শরীরে অসীম শক্তির সঞ্চার হইল; তাহার বোধ হইল, যেন তিনি এক কীলে মদি রাক্ষসীর পিত্তলের মাথাটা চূর্ণ করিয়া দিতে পারেন। তার পর দেবী তাঁহার পৃষ্ঠে এক জোড়া অতি সুন্দর সোণার পাখা লাগাইয়া দিলেন। দিতেই রাজপুত্র আর মাটিতে দাঁড়াতে পারেন না।—আকাশে উঠে উঠে যান; সমস্ত শরীরটা অত্যন্ত লঘু হইয়া গেল। তার পর দেবী একটা অতি মনোহর সোণার উষ্ণীষ তাঁহার মাথায় পরাইয়া দিলেন; দিয়া বলিলেন,—

"নির্ভয়ে, কুমার, যাও দিব্য শক্তি ধরি;
মদিরা বিনাশ কর আশীর্ব্বাদ করি।"—

এই বলিয়া দেবী অদৃশ্যা হইলেন। চঞ্চল তখন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া কহিলেন —'রাজপুত্র, তুমি কোথায়?' রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন—'কেন, এই যে তোমার সম্মুখে, দেখিতে পাওনা নাকি?' চঞ্চল কহিলেন—'কই আমি তো দেখি না; বায়ুর ভিতর হইতে তোমার কথা শুনিতে পাইতেছি মাত্র। তুমি অদৃশ্য হইয়াছ।' পরজিৎ তখন মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া মাটিতে রাখিলেন, অমনি চঞ্চলের দৃষ্টিগোচর হইলেন। চঞ্চল কহিলেন—"ঐ উষ্ণীষের মহিমা এই যে, যে উহা পরে সেই অদৃশ্য হয়—আমি পরি দেখি।" চঞ্চল উষ্ণীষ পরিলে রাজপুত্র আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। চঞ্চল জিজ্ঞাসিলেন—"কেমন, আমাকে দেখিতেছ?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন—"না ; কি আশ্চর্য্য উষ্ণীষ!" তখন চঞ্চল উষ্ণীষ আপন মস্তক হইতে খুলিয়া, পরজিতের মস্তকে পরাইয়া কহিলেন—"চল, এখন যাত্রা করি, পাখা মেল।"

রাজকুমার পিঠের পাখা দু'খানি মেলিলেন ; চঞ্চলের উষ্ণীষ ও পাখা বিস্তার করিল। উভয়ে বহু উচ্চ আকাশে উঠিয়া বৃদ্ধা সুধুম্রা যে দেশে যাইতে বলিয়াছিল সেই দেশাভিমুখে তীব্র-গতিতে ছুটিলেন। কি সুখ!—

নীল আকাশের গায় বায়ু পৃষ্ঠে বয়ে যায়
শরীর আপনি যেন—নাহিক আয়াস ;
স্থূলত্ব নাহিক আর, নাহি বাধা, নাহি ভার ;
অনন্ত উৎসাহ মনে, অনন্ত উল্লাস।
বহু নিম্নে দেখা যায় পটে লিখিতের প্রায়
সাগর, পর্ব্বত, নদী, নগর, কান্তার—
কত ক্ষুদ্র সে সকল— কত ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল ;
অত উচ্চে কোলাহল পশে না ধরার।

যাইতে যাইতে পরজিতের বোধ হইল চঞ্চল ব্যতীত আর যেন কে তাঁহার পাশে উড়িতেছে—অথচ কাহাকেও দেখিতেছেন না। চঞ্চলকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন—"রাজকুমার, ইনি আমার ভগিনী। তুমি যদিও অন্যের অদৃশ্য, তথাপি ইনি তোমাকে দেখিতেছেন, ইনি তোমাকে মদি রাক্ষসীকে দেখাইয়া দিবেন।"

বহুক্ষণ উড্ডয়নের পর তাঁহারা এক মহাসমুদ্রের মধ্যস্থানের

উপর উপস্থিত হইলেন। তখন চঞ্চলের ভগিনী পরজিৎকে কহিলেন—"রাজপুত্র, তুমি চক্ষু মুদ্রিত কর।" রাজপুত্র চক্ষু মুদিলেন। তখন কামিনী কহিলেন—"তুমি যে স্থানে আছ তাহার নিম্নে মহাসাগরস্থ দ্বীপে বালুকার উপর একটী ক্ষুদ্র পাহাড় উপাধানে মদি রাক্ষসীরা তিন ভগিনী নিদ্রা যাইতেছে; তুমি নিম্নদিকে দৃষ্টি কর নাই বলিয়া দেখ নাই। দেখিলে এতক্ষণ প্রস্তর হইয়া পড়িয়া যাইতে।—

পাগল তরঙ্গ রাশি ঘোরনাদ ক'রে
তীর ভূমে ভীমবেগে আছড়িয়া পড়ে।
সেই জল সিঞ্চনেতে স্নিগ্ধ কলেবর,
জুড়াইয়া সেই রবে শ্রবণ কুহর—
অকাতরে নিদ্রা যায় মদি তিনজন,
পর্ব্বতের মত দেহ বিশাল ভীষণ।"

পরজিৎ জিজ্ঞাসিলেন "আমি কি করিব?" কামিনী উত্তর করিলেন "তুমি ঠিক সোজা নামিতে থাক। যখন পৃথিবীর নিকটে পৌঁছিয়াছ বুঝিবে, তখন তোমার ঢাল খানি চক্ষের উপর ধরিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে তাহাতে দৃষ্টি করিবে; দেখিবে তাহাতে রাক্ষসীদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ঐ প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে তাহাদের নিকট যাইয়া শূন্যে থাকিয়াই আপন তরবারি দ্বারা মদির মস্তক ছেদন করিবে।" চঞ্চল কহিলেন—"দেখ রাজপুত্র, তোমার তরবারিতে মদির মস্তক ব্যতীত আর কাহারও মস্তক কাটিবে না। দুই ভগিনীর মধ্যস্থলে যে রাক্ষসী ঐ মদি; দেখ,

যেন উহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও আঘাত করিও না ; করিলে সর্ব্বনাশ—সাবধান ! মস্তকটী কাটিয়াই বাঁ হাতে লইবে ও তীরবেগে উঠিয়া আসিবে—নিমেষ মাত্র বিলম্ব না হয়।"

পরজিৎ কটিবন্ধ হইতে তরবারি লইয়া দৃঢ়রূপে ধরিলেন ও বেগে নামিতে লাগিলেন। তাঁহার ঢালে রাক্ষসীদের প্রতিবিম্বিত হইয়াছে ; কি ভয়ঙ্কর ওঃ !

সাগর গর্জ্জন হতে অধিক ভীষণ
করিতেছে রাক্ষসীরা নাসিকাগর্জ্জন।
তরঙ্গ আছড়ি পড়ে লৌহের কায়ায়,
অতীব বিকট শব্দ হইতেছে তায়।
সুবর্ণের পক্ষগুলি বালুকা উপরে,
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে তপনের করে।
শিরে বিষধরগণ নিদ্রায় বিভোর
রহিয়া রহিয়া তবু গর্জ্জিতেছে ঘোর।
কখনো কু স্বপ্ন দেখি উঠি শিহরিয়া,
বালুকায় নখ মদি দিতেছে বিন্ধিয়া
মেলিছে রক্তিম চক্ষু অর্দ্ধনিদ্রা ঘোরে,
পক্ষদ্বয় আস্ফালন করিছে সজোরে।

তার পর পরজিৎ যখন মধ্যস্থিতা মদি রাক্ষসীর দুই তিন হাত দূরে পঁহুছিলেন, তখন দূরস্থিত চঞ্চলের স্বর বীণা ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—"এই সময়।" তৎক্ষণাৎ তিনি তরবারির এক আঘাতে মদিরার বিশাল মস্তক কাটিয়া

বাঁ হাতে লইলেন ও বিদ্যুৎ বেগে উপরে উঠিতে লাগিলেন। পরজিতের বড় সৌভাগ্য; মদির মাথাটা কাটিতে কি উপরে উঠিতে যদি তাঁহার আর অর্দ্ধ-নিমেষকাল দেরী হইত, তবে আর রক্ষা ছিল না। তাঁহারও তরবারির আঘাত, মদিরও জাগিয়া চক্ষু মেলন। মাথা কাটার সঙ্গে সঙ্গে মদির মাথার সাপগুলিও মরিল। রাজপুত্র আপনার ঢালে দেখিতে লাগিলেন বাকী দুই রাক্ষসী তখনই জাগিয়া উঠিয়া ঘোর আস্ফালন করিতে লাগিল, চারিদিকে কোন শত্রু দেখিতে না পাইয়া, কাল ও পুচ্ছের আঘাতে পাহাড়টী চূর্ণ করিতে লাগিল, তা'দের বিষাক্ত নিশ্বাস অতি উচ্চে, যেখানে রাজপুত্র উড়িতেছিলেন প্রায় সেইখান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে লাগিল, তাহাদের সর্পগুলি ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে জিহ্বা বাহির ও অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। ততক্ষণ পরজিৎ ও চঞ্চল তাঁহার ভগিনীর সহিত মিলিত হইলেন।

মদি রাক্ষসীকে সংহার করিয়া রাজকুমার গৃহে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন মাতা গৃহে নাই। শুনিলেন পুরদক্ষের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি নীলদ্বীপের এক দূরবর্ত্তী স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। পাপিষ্ঠ পুরদক্ষের প্রতি পরজিতের অত্যন্ত রাগ হইল। এদিকে পরজিৎ আসিয়াছেন শুনিয়া কুবুদ্ধি রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ও মুখের ভালবাসা দেখাইয়া, তাঁহার মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন,—"বৎস পরজিৎ, তুমি মদি রাক্ষসীকে বধ করিয়া তাহার মস্তক আনিয়াছ

তো ? আমি উহার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া আছি।" পরজিৎ কহিলেন—"আমি মদিকে বধ করিয়াছি ও তাহার মস্তক আনিয়াছি, কিন্তু উহা আপনাকে দেখাইবার ইচ্ছা নাই।" এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত কুপিত হইলেন—তাঁহার দুষ্ট পুত্র এবং মন্ত্রীরা ততোধিক কুপিত হইল। রাজা ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—"তুমি এখনই মদি রাক্ষসীর কাটা মাথা আমাদিগকে দেখাও, নতুবা তোমার কাটা মাথা আমরা সকলে এখনই দেখিব।" তখন পরজিৎ দেখিলেন অন্য উপায় নাই; কহিলেন, —"আমি মদি রাক্ষসীর কাটা মাথা আপনাদিগকে দেখাইব; আপনারা অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া তিনি আপন গৃহ হইতে এক ঝাঁপী লইয়া আসিলেন এবং নিজে চক্ষু মুদিয়া তাহা হইতে রাক্ষসীর মস্তক বাহির করিয়া রাজা, তাঁহার পুত্র ও দুষ্ট মন্ত্রিগণের চক্ষের সমক্ষে উহা ধরিলেন। তৎক্ষণাৎ উহারা সকলে পাষাণ-মূর্ত্তি হইয়া যে যে ভাবে ছিল—বসিয়াছিল কি দাঁড়াইয়াছিল—সে সেই ভাবেই রহিল। পরজিৎ পুনরায় ঝাঁপীর মধ্যে মস্তক রাখিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পাপিষ্ঠগণের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।

তার পর ? তার পর পরজিৎ মদি রাক্ষসীর বিশাল মস্তকটী সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলেন। সেটী জলমগ্ন পর্ব্বত হইয়া আছে; এখনও অনেক জাহাজ তাহাতে ঠেকিয়া নষ্ট হয়। তিনি মাতাকে কুটীর হইতে লইয়া আসিলেন; পুরন্দক্ষের ভ্রাতা বৃদ্ধ ধীবরকে রাজবাটীতে আনিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিলেন

এবং নিজে পুরদক্ষের রাজ্যে রাজা হইয়া ও মালদ্বীপের রাজকন্যা উষাবতীকে বিবাহ করিয়া সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল—এখনও আছে; নাই যদি থাকিবে, তবে আমি এ কাহিনী কোথায় পাইলাম ?

মায়াবিনী কিরীটিনী।

দেখ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেশ দেশান্তর হইতে রাজগণ আসিয়া হয় কৌরবের পক্ষে নয় পাণ্ডবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের যে রাজা পাণ্ডবদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করেন তাঁহার নাম মতিমান। যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি তরি আরোহণ করিয়া স্বগণসহ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার অনেক বিপদ উপস্থিত হয়—সে কথা পরে বলিব। তিনি ভীমকে বলিয়া তাঁহার পিতা পবন দেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন—"পবনদেব, আমাকে সমুদ্র-পথে যাইতে হইবে, ঝড় ও বিরুদ্ধ বাতাস্ বহিলে দেশে যাইতে অনেক কষ্ট হইবে; আপনি এরূপ কোন উপায় করিয়া দিন যে, যত দিন আমাকে সমুদ্রে থাকিতে হয় ততদিন ঝড় ও বিপরীত বাতাস না বহে।" তাহাতে পবনদেব ভারতসমুদ্রবাসী তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে যাহারা কোপন ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব ছিল, যাহারা পরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসিত, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া কতগুলি বড় বড় থলীতে তাহাদিগকে আবদ্ধ করেন, এবং ঐগুলি মতিমানের হাতে দিয়া তাঁহাকে বলেন,—

"এই থলীগুলি জাহাজে করিয়া লইয়া যাও; সাবধান, বাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বে ইহাদের মুখ খুলিও না, তবেই তুমি সুবাতাসে সুখে যাইতে পারিবে।" মতিমান তাহাই করেন। জাহাজে উঠিয়া দিন কতক বেশ গেল। তাঁহার সহচরেরা থলীগুলিতে কি আছে না আছে জানিত না, কিন্তু জানিবার ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল। এক দিন তাহাদের স্কন্ধে ভূত চাপিল; তাহারা মতিমানের অসাক্ষাতে থলীগুলির মুখ খুলিল। আর রক্ষা করে কে? অমনি যে দিকে তরি চলিতেছিল তাহার বিপরীত দিকে—

প্রবল বহিল ঝড় ভাম গরজনে,
উন্মত্ত তরঙ্গরাশি ধাইল গগনে।
তীরবৎ ছোটে তরি, হাবু ডুবু খায়,
অতলেতে কভু ডোবে কভু শূন্যে ধায়।

যাহা হউক, জাহাজ খানি বহু দিনের পথ দূরে এক দ্বীপে যাইয়া ঠেকিল। প্রাণে প্রাণে সকলে বাঁচিল; কিন্তু অত্যন্ত দুরবস্থায়। জাহাজে আহার্য্য পানীয় যাহা কিছু ছিল সমস্তই গিয়াছে। সকলে অনাহারে, অনিদ্রায়, শীতে, ভয়ে, কম্পমান। মতিমান সহচরগণসহ তীরে উঠিয়া শুনিলেন, তীরস্থিত এক পর্ব্বত-চূড়া হইতে অতি মধুর বংশীধ্বনি হইতেছে। তাঁহারা সেই দিকে চলিলেন; চূড়ায় উঠিয়া দেখেন, একটী পরমা সুন্দরী যুবতী বাঁশী বাজাইতেছে। তাঁহারা তাহাকে কোন দেবী মনে করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন; মতিমান কাতরস্বরে কহিলেন,—

"ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মোরা ওষ্ঠাগত প্রাণ
তুমি দেবী, দয়া করি কর পরিত্রাণ।"

যুবতী কোন কথা কহিল না; উঠিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে পর্ব্বত-চূড়া হইতে নামিতে লাগিল; মতিমান ও অন্য সকলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে দেখিতে লাগিলেন, পথের দুই পার্শ্বে পুঞ্জ পুঞ্জ অস্থি এবং মনু. ও পশুপক্ষীর মৃতদেহ সকল কোনটার অৰ্দ্ধেক, কোনটার বা অল্প অংশ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া কাহারও কাহারও মনে ভয়সঞ্চার হইল; কিন্তু সেই সময়ে সেই রমণী এতই মধুর রবে বাঁশী বাজাইতেছিল যে তাহাদের অধিকাংশ লোকেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেছিল— তাহারা যেন স্বপ্নে ভ্রমণ করিতেছিল। মতিমান প্রকৃতিস্থ ছিলেন। তিনি সাবধানে চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে চলিলেন। অবশেষে তাঁহারা সারি সারি কতগুলি গুহার অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন। রমণী একটী গুহাতে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্যা হইল; কিন্তু বাঁশী থামিল না। মতিমান সঙ্গিগণের সকলের আগে ছিলেন; তিনি দেখিলেন যে রমণী গুহা মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষণমাত্র পরেই সেই গুহা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গুহা সকল হইতে বহুসংখ্যক রাক্ষস ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে বাহির হইল। তাহারা সকলে কি ভীষণমূর্ত্তি!—

অত্যন্ত উন্নত, স্থূল, ঘোর কৃষ্ণকায়,
সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ ভীম যমদূত প্রায়।

ললাটের মধ্যস্থলে একটি নয়ন
প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় অগ্নির বরণ।
নাসা নাই আছে মাত্র দুই ছিদ্র তার,
আকর্ণ বিস্তৃত মুখ বিকট আকার।
তীক্ষ্ণ দন্ত শ্রেণীদ্বয় শ্বেত আভাময়,
প্রস্তর পড়িলে তাহে বুঝি চূর্ণ হয়।
অতি রুক্ষ কেশগুলি রক্তিম বরণ।
বীরদর্পে দাঁড়াইয়া রয়েছে যেমন।
কুলার মতন কর্ণ সদা সঞ্চালিয়া
মুখ হ'তে মাছিগুলি দেয় তাড়াইয়া।
নখগুলি বাড়িয়াছে কোদালের প্রায়
বিদরে কঠিন শিলা তাহাদের ঘায়।

মতিমান তরবারি খুলিলেন, তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে যাহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল না তাহারাও তরবারি খুলিয়া তাঁহার পার্শ্বে সারি বান্ধিয়া দাঁড়াইল ; আর সকলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল—যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। ক্ষণকাল মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণের মধ্যে অনেকগুলি কাটা গেল, কতকগুলি মতিমানের অবশাঙ্গ সহচরগণকে ধরিয়া লইয়া পলায়ন করিল। তাহাদিগের আর উদ্ধার হইল না। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ও পরিশ্রমে মৃতপ্রায় যোদ্ধাগণ তাঁহাদের জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সত্বরে জাহাজ ভাসাইয়া সমুদ্র মধ্যে গেলেন। এমন স্থানে কি আর তিলার্দ্ধও থাকিতে আছে ?

আবার বহুদিন সমুদ্রের উপর বিচরণ করিতে করিতে তাঁহারা আর একটী দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন; বহুদিন সমুদ্রের মৎস্য ও লবণাক্ত জল ব্যতীত আর কিছুই আহার ও পান করেন নাই। নাবিকগণ তীরে নামিয়া কাঁকড়া, শামুক ও ক্ষুদ্র মৎস্যাদি সংগ্রহ করিল; সকলে তাহা দ্বারা কথঞ্চিৎ ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন। কয়েক দিন এইরূপে গেল; কিন্তু এরূপে কত দিন চলে? কেহই দ্বীপের অভ্যন্তরে যাইতে সাহস করে না; পাছে আবার রাক্ষসগণের হাতে পড়ে। নাবিকগণ ও সৈন্যগণ ক্ষুধার জ্বালায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল; তাহারা তাহাদের দলপতি কিম্বা মতিমানের কথা বড় শুনে না—অত্যন্ত অবাধ্যতা করে। এক দিন মতিমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া সকলকে কহিলেন,—"তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি দ্বীপের অভ্যন্তরে কিছু দূর যাইয়া দেখি কিছু খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারি কি না।" পরে কটিদেশে তরবারি বান্ধিয়া এবং পৃষ্ঠে ঢাল ও হস্তে বর্ষা লইয়া যাত্রা করিলেন।

তিনি তীর-দেশ ছাড়িয়া এক পাহাড়ে উঠিলেন; তাহার চূড়ায় দাঁড়াইয়া অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহখানি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল, তাহার চূড়া সকল সূর্য্য কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। লোকালয় দেখিয়া এক বার তাঁহার মনে আনন্দ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদ উপস্থিত হইল; ভাবিলেন, কি জানি রাক্ষস কি অসুরের আবাসই যদি হয়? ইত-

স্তুতঃ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া এক মাঠের মধ্য দিয়া চলিলেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃক্ষসমূহ নানাফুলে সুশোভিত হইয়া আছে, অনতিদূরে ক্ষুদ্র নিঝরিণী কুল কুল করিয়া বহিতেছে—স্থানটী বড় মনোরম। একটী অতি সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষী তাঁহার স্কন্ধের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিল। পক্ষীটির মাথায় সোণার পালক সোণার মুকুটের মত এবং গলায় সোণার রেখা সকল সোণার হারের মত দেখা যাইতেছিল। সে মতিমানের স্কন্ধের উপর বসিয়া অতি করুণ ধ্বনি করিতে লাগিল—'যে—ও না! যে—ও না! যেও না! যেও না!' এবং তাহার ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয় দ্বারা তাঁহার মুখে আঘাত করিতে লাগিল, যেন কথা ও কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে বারণ করিতেছে। মতিমানের মনে সন্দেহ হইল। তিনি পাখীটাকে হাতে লইয়া আদর করিয়া কহিলেন—"তুমি কি আমাকে ঐ গৃহে যাইতে বারণ করিতেছ?" পাখীটি যেন প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল—"হাঁ বারণ করিতেছি," ও বার বার 'যে—ও না! যে—ও না! যেওনা যেওনা!' শব্দ করিতে লাগিল। মতিমান ভাব বুঝিবার জন্য ফিরিয়া চলিলেন।

তখন পক্ষীটি তাঁহার স্কন্ধ হইতে উড়িয়া যাইয়া বৃক্ষশাখে বসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল, যেন তিনি ফিরিয়া চলিয়াছেন বলিয়া তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে। মতিমান থামিলেন; পক্ষীটিরও নৃত্য থামিল। তিনি গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিলেন,

সেও আবার উড়িয়া আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়া 'যে—ও না, যে—ও না' শব্দ করিতে লাগিল ও তাঁহার মুখে চোখে পাখা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। মতিমানের আর বুঝিতে বাকী রহিল না; তিনি এবার দ্রুতপদে সমুদ্রতীরে ফিরিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে পাহাড়ের মধ্যে একটা হরিণ শিকার করিয়া লইয়া গেলেন।

তরীতে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহচর ও নাবিকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন সমস্ত বলিয়া অবশেষে কহিলেন,—"ঐ গৃহে নিশ্চয় কোন রাক্ষস বাস করে, নতুবা চতুষ্পার্শ্বে জন-মানবের বাস নাই কেন?" এ সময়ে তাহারা সকলে এ কথা শুনিল। পরে সেই হরিণের মাংসে সেদিনের মত আহার চলিল। পরদিন আবার ক্ষুধার জ্বালা; সেদিন আর এক জন পাহাড়ে গিয়া আর একটী হরিণ মারিয়া আনিল। এইরূপে মাসেক কাল চলিল। শেষে আর চলে না; কেন না খাদ্যপোযোগী পশু আর পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে কেহ কেহ এরূপ তর্ক করিতে লাগিল যে 'যদি এই দ্বীপে রাক্ষসের বাসই হইবে, তবে তাহারা এখানে আসিতেছে না কেন? যে গৃহের কথা শুনিতেছি সে গৃহ এখান হইতে অধিক দূর নহে। এ দ্বীপে কি ঐ গৃহে রাক্ষসেরা থাকিলে অবশ্যই তাহারা এত দিনে আমাদের সন্ধান পাইত। রাক্ষস টাক্ষস কিছু নয়; আমরা বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া কষ্ট পাইতেছি।' মতিমানের সহচরগণ

এইরূপ তর্ক করেন; নাবিকেরা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখায়; ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। অবশেষে মতিমান সকলকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"আমার কথায় যদি না কর প্রত্যয়,
দ্বীপ অভ্যন্তরে যাও, যদি ইচ্ছা হয়।
হয় আপনারা তথা পাইবে ভোজন,
কিম্বা রাক্ষসের পেট করিবে পূরণ।

এক কাজ কর; এস আমরা সকলে দুই দল হই। এক-দলের নেতা আমি; অন্যদলের নেতা আমার সহচর সুদক্ষ। এক দল জাহাজে থাকুক, অন্য দল দ্বীপাভ্যন্তরে যাক্। যদি কোন বিপদ ঘটে, যাহারা যাইবে তাহারা যদি রাক্ষসের হাতে মারা পড়ে, তবে অন্য দল দেশে যাত্রা করিবে। সকলে এক-সঙ্গে বিনষ্ট হইবার প্রয়োজন কি?" তখন কোন্ দল থাকিবে এবং কোন দল যাইবে স্থির করিবার জন্য মতিমানের আজ্ঞা-ক্রমে এক জন নাবিক একটি শামুক কুড়াইয়া আনিল। এইরূপ কথা হইল যে ঐ শামুকটী ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া মারিলে যদি চিৎ হইয়া মাটিতে পরে তবে মতিমান তাঁহার দল লইয়া যাইবেন আর যদি উবু হইয়া পড়ে, তবে সুদক্ষ তাঁহার দল লইয়া যাইবেন, অপর দল জাহাজে থাকিবে। শামুক উবু হইয়া পড়িল। তখন সুদক্ষ তাঁহার দল সঙ্গে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।—

বিদায়ের কালে সবে কোলাকুলি করে;
কারো দুই গণ্ড বাহি অশ্রুজল ঝরে।

কেহ বলে "ফিরে যদি না আসি আবার,
মায়েরে জানা'ও, ভাই, প্রণাম আমার।
প্রিয়ারে কহিও যেন না করে রোদন
যতনে সন্তানগুলি করে সে পালন।"
কেহ বৃদ্ধ জনকেরে প্রণাম জানায়,
কেহ ভক্তিভরে ডাকে জগৎপাতায়।

সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া চলিল; সুদক্ষ সকলের অগ্রে। পাহাড় পার হইয়া মাঠে নামিলে, তাহারা বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। সেই হরিদ্রাবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষী তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল—'যে-ওনা! যে-ওনা! যেওনা! যেওনা! যেওনা!' এবং অগ্রবর্ত্তী সুদক্ষের স্কন্ধের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিল—পূর্ব্বের মত পাখা দ্বারা তাঁহারও মুখে চোখে আঘাত করিতে লাগিল। সুদক্ষ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"কি যাব না?" পাখী বলিল—'যে-ও না!' সুদক্ষ যেমন বুদ্ধিমান্ জীবের সহিত কথা কহিতেছেন, এইরূপ ভাবে পাখীটার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,—"দেখ, পাখি, আমরা যাব ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে এসেছি, না গিয়ে পারি না; রাক্ষস আমাদের কিছু কর্‌তে পারবে না।" পাখী সে কথা শুনিল না; ক্রমাগত অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে একজন হইতে অন্য জনের স্কন্ধে যাইয়া বসিতে লাগিল, তাহাদের মুখে চোখে পাখা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত কাতরভাবে 'যেওনা! যেওনা!' রব করিতে লাগিল। চীৎকার

করিতে করিতে যেন ক্ষুদ্র পক্ষীটীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। পরে সুদক্ষ যখন তাঁহার দলসহ বহুদূরে অগ্রসর হইলেন, তখন সে তাহার বৃক্ষশাখে ফিরিয়া গেল; তথাপি তাঁহারা দূর হইতে শুনিতে লাগিলেন, সে থাকিয়া থাকিয়া অতি করুণস্বরে 'যে-ও না! যে-ওনা!' করিতেছে।

সকলে গৃহের সন্নিকটে পঁহুছিলে নাবিকগণের মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল; কেন না তাহারা নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনের আঘ্রাণ পাইতেছিল। সমস্ত ভয় ভুলিয়া গিয়া কতক্ষণে উদর পূর্ণ করিবে তাহারা এই ভাবনাই ভাবিতে লাগিল।

কেহ বলে, "মাংস-পাক হ'য়েছে নিশ্চয়,"
কেহ বলে, "ইলিসের ব্যঞ্জন বা হয়,"
কেহ মুখ চেটে বলে "বুঝি সূপকার
বুটের ডালেতে দেয় ঘৃতের সম্ভার!"
কারো, লালায়িত জিহ্বা আধ-আধ বলে,—
"এইবার লুচি ভাজে পাচক সকলে!
আহা রে সন্দেশ! আহা পরমান্ন ধন!
কবে আর তোমাদিকে করিব ভক্ষণ!"

সহসা তাহারা অত্যন্ত চমকিত হইল। একপাল সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, শশক প্রভৃতি পশু আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। চমক ভাঙ্গিলে কেহ বা তরবারি খুলিল, কেহ বর্শা লইল, কেহ বা পলাইবার চেষ্টা করিল। পরক্ষণেই দেখা গেল, পশুগুলির ভাবভঙ্গিতে কোন অনিষ্টের ইচ্ছা বা চেষ্টা

নাই তাহারা কেহ কুকুরের মত লেজ নাড়িতেছে, কেহ তাহাদের পদতলে গড়াগড়ি যাইতেছে, কেহ বা সম্মুখের দুই পা তুলিয়া, তাহাদের গায় পড়িয়া তাহাদিগকে আদর করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা পরস্পরেও বিবাদ করিতেছে না। তাহাদের অত্যন্ত কাতর ভাব, হাউ মাউ করিয়া যেন মনের বেদনা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সুদক্ষ বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি সঙ্গিগণকে বলিলেন,—

"সাবধানে কটিবন্ধ বান্ধ, বন্ধুগণ,
বুঝে সুঝে অগ্রসর হইও এখন।
অসুর, কিন্নর, নাগ, যক্ষ, রক্ষ নয়
অন্যরূপ শত্রুসনে কিবা ভেট হয়।
যে দেখি অদ্ভুত দৃশ্য—হিংস্র পশুগণ
অহিংস্র পশুর সনে করে বিচরণ ;
হিংসা ভুলি ব্যাঘ্র দেখ কাতরতা করে,
সিংহগুলি পদতলে লুটাইয়া পড়ে
এই গৃহ হয় কোন দেবতা-নিবাস
অথবা এ কোন ঘোর মায়াবীর পাশ।"

এই সময়ে গৃহমধ্য হইতে অতি মধুর সঙ্গীতধ্বনি আসিতে লাগিল ; মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তার শব্দও শুনা যাইতে লাগিল ; আর সেই অন্ন ব্যঞ্জনের গন্ধে নাসিকা তৃপ্ত হইতে লাগিল। সুদক্ষের সহচরগণ আবার ভয় ভুলিয়া নাসিকা ও কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। ক্ষুধানলও জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারা আর

ধীরপদে চলিতে চায় না। তাহারা দ্রুতগতিতে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানসমূহে আরোহন করিতে লাগিল। তাহাদের পদশব্দে গীতবাদ্য কি কথাবার্ত্তা থামিল না। তাহারা যে কক্ষ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে আগ্রহসহকারে চলিল। তাহারা কক্ষে প্রবেশ করিল। সুদক্ষ বাহিরের দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন যে কক্ষ মধ্যে চারি জন যুবতী পালঙ্কের উপরে বসিয়া এক জনে গাইতেছে, এক জনে বাজাইতেছে এবং অন্য দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।—

পরমা রূপসী তা'রা, হেন মনে লয়
সে রূপে যোগীরো কিবা যোগ ভঙ্গ হয়;
কিবা বর্ণ, কিবা মুখ, কিবা সে নয়ন,
তিলোত্তমা দাসী হ'য়ে সেবিবে চরণ,

তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদও অত্যন্ত মনোহর ও মহা মূল্যবান; হীরা, মণি, মাণিক্য ও সুবর্ণালঙ্কার যেখানে যা সাজে সেখানে তা আছে।

সুদক্ষ দেখিলেন যে তাঁহার সহচরগণ কক্ষে প্রবেশ করিবা-মাত্র রমণীরা গীতবাদ্য ও কথোপকথন বন্ধ করিল এবং সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে এক জন—ভাবভঙ্গিতে তাহাকে প্রধানা বলিয়া বোধ হইল—সে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ঈষৎ সলজ্জ-ভাবে, মধুর হাস্যমাখা স্বরে মৃদুমৃদু কহিল,—

"এস, এস, আমরা তো কত আশা ক'রে
পথ চেয়ে বসে আছি তোমাদেরি তরে।
এস, ব'স ; অনাহারে, শ্রমে, ভাবনায়
মুখ শুকায়েছে দেখে বুক ফেটে যায় !
কত যে পেয়েছ কষ্ট, আহা ম'রে যাই,
কি দিয়ে করিব দূর ভাবিয়া না পাই।
আমরা তো পর নই ? এগৃহ, বৈভব—
যাহা কিছু আমাদের—তোমাদেরি সব !
ক্ষণেক বিশ্রাম কর, কর পানাহার,
পরম আনন্দে হেথা থাক অনিবার।"

বলিতে বলিতে রমণীগণ কেহ কেহ পাখা লইয়া তাহাদিগকে বাতাস করিতে লাগিল, কেহ বা নানা সুগন্ধি দ্রব্য তাহাদের শরীরে সিঞ্চন করিতে লাগিল। আগন্তুকগণ পালঙ্কের উপরে বসিয়া আনন্দে, বিস্ময়ে, সন্দেহে, ভয়ে রোমাঞ্চিত শরীরে কখনো রমণীগণের, কখনো পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারো বাক্যস্ফুরণ হইল না। কিন্তু সুদক্ষ বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সহচরগণ যখন রমণীগণের মুখের দিকে না তাকায়, তখন তাহারা এ উহার দিকে আড়চোখে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসে ও মুখভঙ্গি করে। সে হাসি, সে চাহনি ও সে মুখভঙ্গি তাঁহার নিকট বড় ভাল বোধ হইল না।

কতক্ষণ পরে সেই প্রধানা রমণী ভৃত্যগণকে ডাকিয়া, আসন

পাতিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা সত্বরে তাঁহার আদেশ পালন করিল—

পূরিয়া কনক-পাত্র আনে সূপকার
যতনে ব্যঞ্জন, অন্ন বিবিধ প্রকার—
পলান্ন, পায়স, লুচি, খিচুড়ী মধুর,
মৎস্য, মাংস, নিরামিষ, অম্বল প্রচুর ;
দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, মিষ্টান্ন সুতার ;
গন্ধে পেট ভ'রে যায়, কি আর আহার !

আগন্তুকেরা আহারে বসিলে রমণীগণের মধ্যে এক জন বীণা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল, আর তিন জনে তাহাদিগকে ফুলের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। স্তূপাকার অন্নরাশি ধ্বংস করিয়া, যখন সেই ক্ষুদ্র রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ থামিল, কেহ বা শীর কাটিল, তখন কোন রমণী কহিল,—

"একি, বাছা, খাও, ওই ক্ষীর টুকু খাও,
আমার মাথার দিব্য, ছানা না ফেলাও !"

কেহ বলিল,—

"এই পরামান্ন টুকু খাও, যাদুধন,
অজীর্ণ হইবে ভয় করোনা কখন।
ওই যে দেখিছ জল গুণেতে ইহার
লোহা জীর্ণ হয়ে যায়, অন্ন কোন্ ছার !"

তাহা শুনিয়া এক জন নাবিক হাসিয়া উত্তর করিল,—

"বিন্দুমাত্র জলেরো বুঝিবা স্থান নাই
গলায় গলায় পূর্ণ হয়েছে যে, ভাই !"

তখন সেই প্রধানা রমণী হাতে একগাছি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ ছড়ি লইয়া উহা নাড়িতে নাড়িতে কহিতে লাগিল,—

"কেন ? খাও—আরো খাও—আরো এক গ্রাস—
আরো এক গ্রাস খাও—সাবাস ! সাবাস !
কি ক'রে খাইলি এত ? তোদের উদর
মানুষের নহেতো রে—অতল গহ্বর !"

বলিতে বলিতে রমণীর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল ; সে অতি কর্কশ চীৎকার করিয়া হাতের ছড়ি বেগে ঘুরাইয়া কহিল,—

"তোরা তো মানুষ নস্, মানুষের ঘরে
মানুষের খাদ্যে পেট তোদের না ভরে।
তোদের সরম নাই, আমরা সবাই,
ছি ছি ছি ! ব্যাভার দেখে লাজে মরে যাই !
করিলি শূকর প্রায় যেই আচরণ
এখনি শূকরমূর্ত্তি কর্‌রে ধারণ।"

তখন তাহার হাতের ছড়ি আপনা আপনি সাত বার বোঁ বোঁ শব্দ করিল, আর অমনি সুদক্ষের সহচরগণের—

নাক, মুখ দীর্ঘ হয় চোঙের মতন
রক্তবর্ণ ক্ষুদ্রাকার হইল নয়ন !
মস্তকে গজায় কুচি, কোথা গেল চুল,
শরীর হইল খর্ব্ব, গোলাকার, স্থূল।

হস্তপদ খর্ব্ব হয় শূকরের প্রায়,
বন্ধুর হইল চর্ম্ম, কাদামাখা তায়!
জনমিল ক্ষুদ্রপুচ্ছ, ঘন ঘন নড়ে
চারি পায়ে বীরগণ ছুটাছুটি করে।

দেখিয়া মায়াবিনীরা উচ্চহাস্য করিতে লাগিল ও হাতে তালি দিতে লাগিল। কিন্তু—

যদিও শূকর মূর্ত্তি ধরে নরগণ,
মানুষের বুদ্ধি তবু গেল না যেমন।
কান্দিয়া মনের দুঃখ জানাইতে চায়,
ঘোঁত ঘোঁত করে শুধু, বাক্য নাহি পায়;
করযোড় করিবারে বিফল যতন
চরণ তুলিতে হয় ভূমেতে লুণ্ঠন!

তখন প্রধানা মায়াবিনী ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিল—"শূকর-গুলিকে বের করে দাও।" তাহারা তদ্দণ্ডে তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে বাহির করিয়া দিল। আহা কি দুঃখ!

সুদক্ষ এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া আর তিলার্দ্ধকাল সেখানে দাঁড়াইলেন না; গৃহ হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, গলদঘর্ম্ম শরীরে একেবারে সমুদ্রতীরে যাইয়া উপস্থিত। মতিমান্ তাঁহাকে একা দেখিয়াই অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেন হে সুদক্ষ, তুমি একাকী আসিলে,
সহচরগণে, বল, কোথা রেখে এলে?"

সুদক্ষ বসিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিলেন, তাঁহার মুখে কথা ফুটিতেছিল না। শেষে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া মতিমান প্রথমতঃ কিছুকাল হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন। পরে অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে হইতে সুদক্ষকে কহিলেন,—"সুদক্ষ, তুমি যাহারা আছে তাহাদিগকে লইয়া জাহাজে থাক; আমি একা ঐ মায়াবিনীদের গৃহে যাইব। তাহারা আমার সঙ্গিগণের যে দুর্দ্দশা করিয়াছে, হয় তাহাদিগকে পূর্ব্বের মতন মানুষ করিয়া দিবে, নতুবা আমি তাহাদের প্রত্যেকের মাথা কাটিয়া আনিব।" এই বলিয়া তিনি জাহাজ হইতে নামিলেন। সুদক্ষ ও অন্য সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিনয় সহকারে কহিল,—

"একাকী যেও না, দেব, করি অনুনয়,
মায়াবীর মায়াজাল কি জানি কি হয়।
এ তো যুদ্ধ নহে, বীর; শত রণস্থলে
জয়লক্ষ্মী লভিয়াছ নিজ ভুজবলে।
এখানে ধনুক, বাণ, গদা, তরবার,
দেহের শকতি, সাধ্য,—সকলি অসার।
একাকী যেও না সঙ্গে লহ দাসগণ,
চিরদিন লইয়াছ, লবে না এখন?
কার্য্যসিদ্ধি হয়, ভাল, সুখ পারাবার;
না হয়, সমান দশা হইবে সবার।"

মতিমান্ সে কথা শুনিলেন না। মিষ্টবাক্যে কহিলেন,—

"আমার কোন বিপদ ঘটিবে না, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক; আমি শীঘ্র আমাদের সঙ্গিগণকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিতেছি; তোমরা কিছুকাল ধৈর্য্য ধর; কোন ভয় করিও না।"

মতিমান্ চলিলেন। পাহাড় অতিক্রম করিয়া গেলে পূর্ব্ববৎ সেই হরিদ্রাবর্ণ পক্ষীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার হাত ছাড়াইয়া আর কিছুদূর গেলে তিনি দেখিতে পাইলেন কে একটা লোক তাঁহার দিকে আসিতেছে। সে নিকটে আসিলে দেখিলেন, অতি মনোহরকান্তি একটি যুবা পুরুষ—মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষুর্দ্বয় অতি উজ্জ্বল হাস্যময়। হাতে একগাছি ছড়ি, তা'তে দুটি সুন্দর সোণার সর্প জড়িত; ছড়ির মাথায় দুখানি ক্ষুদ্র পাখা। যুবকের মাথায় যে উষ্ণীষ তা'রও দু'পাশে দুখানি পাখার মত। মতিমান্ অত্যন্ত চিন্তান্বিত, মুখখানি ভার, ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছেন। আমার প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ, তোমরা বোধ হয় চঞ্চলকে এতক্ষণ চিনিতে পারিয়াছ। চঞ্চল কহিলেন,—

"বড় বুদ্ধিমান তুমি, রাজা মতিমান,
দেশে দেশে শুনি হে তোমার যশোগান।
এবে কোথা যাও বীর, জান না কি তুমি
কিরীটিনী কুহকীর আবাস এ ভূমি?
পাপিষ্ঠা মানুষরূপ দেখিতে না পারে,
মানুষ পাইলে তারে পশুপক্ষী করে;
যেমন স্বভাব যার তাহাকে তেমন
পশু কি পক্ষীর রূপ করায় ধারণ—

সাহসীকে সিংহ করে; নিষ্ঠুর যে জন,
তাহাকে ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি দেয় সে, রাজন;
যাহারা পেটুক বড় তাহারা শূকর,
সুন্দর কুকুর হয় প্রভু-ভক্ত নর।
বুদ্ধির সাগর তুমি শুনি, মহারাজ,
তুমি বা শৃগালকুল ধন্য কর আজ!"

এই কথা বলিযা চঞ্চল একটু মৃদু হাস্য করিলেন; মতিমানও হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। চঞ্চলের আনন্দমূর্ত্তি দেখিলে ও তাঁহার মধুর স্বর শুনিলে তাঁহার বিদ্রূপ-বাক্যেও রাগ হয় না। মতিমান্ জিজ্ঞাসিলেন,—"এখানে যত পশুপক্ষী আছে, সকলেই কি এককালে মানুষ ছিল?" চঞ্চল কহিলেন,—"প্রায় সকলেই; যাহাদিগের অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখিবে তাহারাই মানুষ ছিল বুঝিও। একটি হরিদ্রাবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষীর সহিত তোমার বোধ হয় দেখা হইয়াছে; তিনি রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ-পরিচ্ছদ, রাজ-মুকুট ও স্বর্ণ-হারের গর্ব্বে সর্ব্বদাই গর্ব্বিত থাকিতেন। কিরীটিনী তাঁহাকে ধরিয়া ঐ দশা করিয়াছে। মায়াবিনীর যা'হোক বুদ্ধি আছে—রাজ-পরিচ্ছদ ছিল, তার পরিবর্ত্তে কাঁচা হরিদ্রার বর্ণের সুন্দর পালক দিয়াছে; মাথায় মুকুটের স্থানে সোণার পালকের চূড়া দিয়াছে; এবং গলাতে সোণার হারের সখ মিটাইবার জন্য উহা সোণার রেখায় সাজাইয়াছে; পাখীটি দেখিতে বড় সুন্দর। কিরীটিনীর গৃহের দরজায় পৌঁছিলে কতকগুলি সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশু দেখিবে,

তাহারা তোমার গা চাটিতে আসিবে, তোমার পদতলে লুটাইবে— তাহারা সকলেই মানুষ ছিল। হরিণগুলি সুনয়না স্ত্রীলোক ও শশকগুলি দ্রুতগতি বালকবালিকা ছিল বলিয়া বোধ হয়। তোমার উদরপরায়ণ সঙ্গিগণ যে শূকর মূর্ত্তি ধরিয়াছেন তা ত জানই। তাই বলি সাবধান।" মতিমান্ বলিলেন,—

"তুমি সব(ই,-জান, দেব, কহ দয়া করি,
কুহকীর মায়াজাল কি উপায়ে ছিঁড়ি ?"

চঞ্চল কহিলেন,—

"যত বুদ্ধি ধর, রাজা, কর ব্যবহার,
আমারো কিঞ্চিৎ তোমা' দিতে পারি ধার।
বুদ্ধি যার বল তার, যথাধর্ম্ম, জয়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কথা, জান, মহাশয়।"

মতিমান কহিলেন,—"তা তো বুঝিলাম ; কিন্তু আমার ঘটে অত বুদ্ধি আছে মনে হয় না। দয়া করিয়া যাহা বলিলে তাহা কর, তোমার ঘট থেকে কিছু ধার দেও।" চঞ্চল কহিলেন,— "এই যে সাদা ফুলটী দেখিতেছ, মাটি ফুঁড়িয়া উটিয়াছে—" মতিমান্ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন,—"কৈ ? আমি তো দেখিতে পাইতেছি না।" চঞ্চল তাঁহাকে চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া দেখিতে বলিলেন। মতিমান্ তাহাই করিলেন ; তখন দেখিলেন, একটী দিব্য সাদা ফুল মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া ফুটিয়া আছে। আসল কথা, ফুলটী পূর্ব্বে সেখানে ছিল না ; চঞ্চল ইচ্ছা করা মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ,চঞ্চল কহিলেন,

—"এই ফুলটী তুলিয়া লও; বড়ই সুগন্ধি ফুল—না?" মতিমান ফুলটী তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ করিলেন। অতি মধুর সৌরভ, পৃথিবীর কোন ফুলে বুঝি এমন সৌরভ হয় না। চঞ্চল কহিলেন, —"কিরীটিনীর গৃহে যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ এই ফুল আঘ্রাণ করিবে; পান ভোজন করিবার পূর্ব্বক্ষণে এই ফুল আঘ্রাণ করিবে; তোমার শরীর যেন সর্ব্বদা এই ফুলের সৌরভে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহার যাদুতে তোমার কোনই অনিষ্ট হইবে না। তারপর অন্যান্য বিষয়ে তোমার বুদ্ধিতে যাহা ভাল বোধ হয় করিও।" এই কথা শুনিয়া মতিমান্ চঞ্চলকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। অল্প কিছু দূর যাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন যে, চঞ্চল অন্তর্হিত হইয়াছেন।

মতিমান্ শীঘ্রই কিরীটিনীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের সেই সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি পশু দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকেও বেষ্টন করিয়া হাউ হাউ করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের হাত ছাড়াইয়া গৃহের সোপান সকলে উঠিতে লাগিলেন। উঠিতে উঠিতে পূর্ব্বের ন্যায় গৃহের এক কক্ষ হইতে গানবাজনা ও কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইলেন—অন্ন ব্যঞ্জনের মনোহর গন্ধও নাসিকায় প্রবেশ করিল। তিনি বিলম্ব না করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া কিরীটিনী ও তাহার সহচরীগণ শশব্যস্তে পূর্ব্বের মত—.

"এস, ব'স ; আমরা তো কত আশা ক'রে
পথ চেয়ে ব'সে, দেব, আছি তব তরে,—"

ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর কথা কহিতে কহিতে তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। কিরীটিনী কহিল,—

"আপনি যে একা ? কোথা সহচরগণ ?
সকলেরি করিয়াছি হেথা আয়োজন।
এক সঙ্গে তোমাদের সেবাশুশ্রূষায়
সার্থকজীবন হ'ব, ছিলাম আশায়।
দুর্ভাগিনী আমাদের মত আর নাই,
হেথা মানুষের মুখ দেখিতে না পাই।
দয়া যদি করিয়াছ, সঙ্গিগণ সনে
স্বচ্ছন্দেতে, মহারাজ, রহ এ ভবনে।"

মতিমান্ কহিলেন—"সম্প্রতি আমি একাই আসিয়াছি ; তোমার সঙ্গে একটু প্রয়োজন আছে। আমার সহচরগণের আসিতে হয়, তাহারা পরে আসিবে।" মতিমান কথা কহিতেছেন আর হস্তস্থিত ফুলটী সুঁকিতেছেন। কিছুকাল পরে কিরীটিনীর আজ্ঞা অনুসারে ভৃত্যগণ খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া পরিবেশন করিল এবং বসিবার জন্য স্বর্ণখচিত আসন পাতিয়া দিল। মতিমান আহারে বসিলেন। কিরীটিনী তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গিনীগণ গীতবাদ্য আরম্ভ করিল। মতিমান এক এক গ্রাস আহার করেন আর এক একবার ফুলের আঘ্রাণ লন। তিনি অল্প পরিমাণ ভোজন করিয়াই আচমন

করিলেন। কিরীটিনী পাখা ফেলিয়া বস্ত্রাঞ্চলের মধ্য হইতে তার ছড়ি গাছটী লইল এবং উহা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিল,—

"তোমার বুদ্ধির খ্যাতি জগৎ সংসারে,
কি বুদ্ধিতে এলে, বাপু, কিরীটির ঘরে ?
যে মানুষ মোর অন্ন খায় একবার
মানুষের মূর্ত্তি তার রহেনাকো আর।"

শেষে ক্রোধকম্পিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—

"কেন বেন্ধেছিস্ দেহে ঢাল, তরবার—
মনে বুঝি আমাদিকে করিবি সংহার ?
কি বিক্রম তোর, ওরে অন্নহীন বীর,
ভিক্ষা ছলে আসি প্রাণ বধিস্ নারীর !
শোন্ বলি, ধূর্ত্তপনা করিলি যেমন,
কাপুরুষ, শিবামূর্ত্তি কর্‌রে ধারণ !"

মতিমান ততক্ষণ ফুলের আঘ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে লইতে-ছিলেন। মায়াবিনীর হাতের ছড়ি সাতবার আপনা আপনি বোঁ বোঁ শব্দ করিয়া মতিমানের মাথার উপর ঘুরিল। কিন্তু তাঁহার দেহের কোনই বিকার হইল না। মতিমান বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া তরবারি খুলিলেন এবং এক হস্তে কিরীটিনীর কেশাকর্ষণ করিয়া অন্য হস্তে উহা তাহার গলদেশে স্থাপন করিলেন। কহিলেন,—

"ঘোর মায়াবিনী তুই, ওরে রে পাপিনি ;
বীরের অবধ্যা তবু অবলা কামিনী।

তোর মন্ত্রতন্ত্র কিছু লাগে না আমারে,
দেবতা আশ্রিত আমি কহিলাম তোরে।
আতিথ্যের ছল করি মায়ামন্ত্র বলে
শূকর করিয়াছিস্ মোর সঙ্গিদলে।
ভাল যদি চাস্, কহি, এই লহমায়.
আপন আপন মূর্ত্তি ফিরে দে সবায়।"

কিরীটিনী মতিমানের হস্তে প্রবল বাতাসে বটপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল; তাহার সহচরীদের মধ্যে একজনে কান্দিতে কান্দিতে জল হইয়া কক্ষের মধ্যে ঢেউ খেলিতে লাগিল; অন্য দুইজনে ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে বায়ুর সঙ্গে মিলাইয়া গেল; তখন আর তাহাদিগকে দেখা গেল না, কেবল চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল। কিরীটিনী কাতরস্বরে কহিল,—

"ক্ষম অপরাধ, কর ক্রোধ সম্বরণ,
এখনি তোমার আজ্ঞা করিব পালন।"

পশ্চাৎ হইতে চঞ্চল কহিলেন,—

"পড়েছ শক্তের হাতে, বাছারা সকল,
যা' বলে তা' কর, তবে এখনো মঙ্গল।"

মতিমান্ চঞ্চলকে অভিবাদন করিলেন। চঞ্চল কক্ষস্থিত জল প্রবাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—

"নির্ঝরতনয়ে, শোন, আমার আজ্ঞায়
এই দণ্ডে নিজমূর্ত্তি ধর পুনরায়।"

তখন জল ক্রমশ ঘন হইতে হইতে আকৃতি প্রাপ্ত হইতে

মতিমান ও মায়াবিনী কিরীটিনী।

কৌতুক-কাহিনী—১৩৮ পৃষ্ঠা।

লাগিল—অবশেষে দিব্য রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চঞ্চল কক্ষস্থিত চীৎকার ধ্বনি সকল লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"প্রতিধ্বনিসুতা ওরে মায়াবিনীগণ,
এখনি আপন মূর্ত্তি কররে ধারণ।"

তখন বায়ু মধ্যে প্রথমতঃ ধূমের মত দেখা গেল; ক্রমে সেই ধূম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অল্পে অল্পে আকৃতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; অবশেষে পূর্ব্বের ন্যায় দুইটী পরমাসুন্দরী যুবতী হইয়া কক্ষমধ্যে দাঁড়াইল।

অনন্তর কিরীটিনী মন্ত্রবলে মতিমানের সহচরগণকে পুনরায় আপন আপন মনুষ্যমূর্ত্তি প্রত্যর্পণ করিল। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহাদের—

দীর্ঘনাসা খর্ব্ব হয়, মুখ গোলাকার
মানুষের চক্ষুর্দ্বয় হইল আবার;
খর্ব্ব, স্থূল, রুক্ষদেহ নরদেহ হয়,
দুই হস্ত, দুই পদ পদ চতুষ্টয়।
মস্তকের কুচি হয় কেশ পুনরায়,
মানুষের ভাষা সবে সেই দণ্ডে পায়।

ইতি মধ্যে সেই হরিদ্রাবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া মতিমানের স্কন্ধের উপর বসিল ও কাতরোক্তি করিতে লাগিল। মতিমান কিরীটিনীকে কহিলেন,—

কি দুর্দ্দশা করিয়াছ এই নৃপতির,
এঁরে ফিরে দেও এঁর আপন শরীর।"

কিরীটিনী সে আজ্ঞাও পালন করিল। তখন পূর্ব্বদেহপ্রাপ্ত সেই নরপতি চঞ্চল ও মতিমানকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই কক্ষ সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ ও শশক প্রভৃতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। মতিমান মায়াবিনীকে আজ্ঞা দিতে উদ্যত হইলেন—"ইহাদিগকে আপন আপন পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রদান কর।" এমন সময়ে চঞ্চল কহিলেন,—

"কি কর, কি কর তুমি না বুঝে, রাজন,
কথা শুন, এ আদেশ দিও না কখন।
এই সিংহ, ব্যাঘ্র আর ভল্লুক নিচয়
নরদেহে আছিল বড়ই পাপাশয়—
নিষ্ঠুর, ভীষণ, মহাশক্তিমান, খল,
সর্ব্বনাশ, সর্ব্বগ্রাস করিত কেবল।
ইহাদের পশুমূর্ত্তি সেজেছে, রাজন,
হৃদয়ে ছিলই পশু দেহেও এখন।
এ সকলে খেদাইয়া লোকালয় হ'তে
মায়াবিনী পুণ্যকাজ করেছে জগতে।
ইহাদিগে নররূপ দিতে পুনরায়
চেওনা চেওনা, রাজা, কহিনু তোমায়।"

মতিমান কহিলেন,—"ভাল; কিন্তু ঐ যে হরিণ ও হরিণী ও শশকগুলি আসিয়াছে, ইহারাও ইহাদের পূর্ব্বের মানুষরূপ পাইবার উপযুক্ত নহে কি?" চঞ্চল উত্তর করিলেন,—

"দেখি'ছ যে হরিণ, হরিণী এই সব
সুনয়ন সুনয়না আছিল মানব ;
এই শশকের দল সুন্দর বরণ
ছিল দ্রুতগতিশীল মানুষ, রাজন ;
কিরীটিকে আজ্ঞা দাও যেন এ সবায়
পূর্ব্বের মানুষরূপ দেয় পুনরায়।"

মতিমান্ সেইরূপ আদেশ করিলে হরিণহরিণীগণ ও শশকগণ কিরীটিনীর মন্ত্রপ্রভাবে নিজ নিজ মানুষরূপ ধারণ করিল। আহা! তাহাদের আনন্দ আর ধরে না। পুরুষগণ প্রকাশ্যে ও স্ত্রীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া মুক্তকণ্ঠে চঞ্চল ও মতিমানের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

অনন্তর চঞ্চল অধোবদনা কিরীটিনীকে কহিলেন,—"কিরীটিনি, তোর হাতের ছড়ি আমাকে দে।" মায়াবিনী ভয়ে বিবর্ণা হইয়া ছড়ি চঞ্চলকে দিল। চঞ্চল উহা তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া ফেলিলেন। আগুন নিভিলে মতিমান চাহিয়া দেখিলেন, কিরীটিনী ও তাহার সহচরীগণ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছে। মতিমান্ চঞ্চলকে কহিলেন,—"দেব, এই কিরীটিনী এবং তাহার সঙ্গিনীগণ অতীব লাবণ্যবতী ও সুন্দরী ; যদিও ইহারা অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তথাপি ইহাদের জন্য আমার দুঃখ হইতেছে। ইহারা পাপ মায়াবিদ্যা ভুলিয়া যাইতে পারিলে নরসমাজে অত্যন্ত আদরণীয়া হইতে পারিত।" চঞ্চল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, —"বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। কিরীটিনীর মায়াবল

তোমার শরীরকে শৃগালের শরীর করিতে পারে নাই, কিন্তু তার সুন্দর মুখখানি তোমার হৃদয়কে ভেড়া বানাইয়াছে। ভাল, দেখি কোন উপায় হয় কিনা।" ক্ষণকাল পরে তিনি মতিমানকে পুনরায় কহিলেন,—

"তোমার হাতের ফুল করাও আঘ্রাণ
মুহূর্ত্তে ইহারা সবে করিবে উত্থান।"

তাহাই হইল। পুষ্প আঘ্রাণ করা মাত্র রমণীগণ উঠিয়া বসিল, কিন্তু অতি লজ্জাসঙ্কুচিতভাবে। তাহাদের প্রগল্‌ভতা আর নাই। চঞ্চল কিরীটিনীকে কহিলেন—"ভদ্রে, তুমি কে, আর এই যুবতাগণই বা কাহারা?" কিরীটিনী সঙ্কুচিতভাবে কহিল—"দেব, আমার পূর্ব্বকথা কিছু মনে পড়িতেছে না—আমি কিছুই জানি না। আমার বোধ হইতেছে, আমি মর্ত্ত্য-লোকে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিলাম।" তাহার সহচরীগণকে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারাও ঐরূপ উত্তর করিল। তখন চঞ্চল মতিমানকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—"মতিমান, তোমার ইচ্ছা সফল হইয়াছে। মায়াবিনীদের যাদু-দণ্ড পুড়িয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে; ইহাদের সত্য সত্যই এইমাত্র পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে; কেবল দেহের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাদের পূর্ব্ববিদ্যা ও পূর্ব্বকথা কিছুই মনে নাই, কখনও মনে হইবেও না। তুমি এই চারিটী পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতীদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পরিণয় করিতে পার; অন্য তিনটীকে তোমার

প্রধান প্রধান তিনজন বয়স্যকে অর্পণ কর।” এই বলিয়া চঞ্চল মতিমানকে রমণীগণের নিকট যাইতে কহিয়া নিজে পশ্চাতে রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহাকে কেহ আর খুঁজিয়া পাইল না।

তাঁহাকে পাইল না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শুভকার্য্য স্থগিত রহিল না। মতিমান কিরীটিনীকে, সুদক্ষ নির্ঝর-তনয়াকে, এবং মতিমানের অন্য দুই জন প্রধান সহচর প্রতিধ্বনি-কন্যা দ্বয়কে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন! কে যে এতগুলি কন্যা সম্প্রদান করিল, এবং “ইতর” জন ঐ বিবাহোৎসবে মিষ্টান্ন পাইয়াছিল কিনা তাহা ইতিহাসে লেখে না।

বীরদন্ত নাগ।

ভারতসমুদ্র-তীরস্থ সিকতা রাজ্যের রাজা অগ্রসেনের তিন পুত্র,—কদম্বসেন, পুণ্যসেন ও কালিকেশ এবং এক কন্যা,—মাধুরী। এই চারিজন এবং মন্ত্রীপুত্র সত্যধীর একত্রে সমুদ্রতীরে খেলা করিত। বালিকার বয়স সাত আট বৎসর হইবে, বালকদের মধ্যে কাহারো বয়স পনেরর অধিক নহে। তাহারা কি খেলা করিত জান? রাজার বাগান হইতে রাশিরাশি ফুল তুলিয়া আনিয়া ফুলের মালা, ফুলের বালা, ফুলের মুকুট ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বালকেরা মাধুরীকে সাজাইত; তার পরে বালি তুলিয়া ও বালি খুঁড়িয়া মন্দির প্রস্তুত করিত এবং মাধুরীকে তাহার মধ্যে বসাইয়া পূজা করিত; কখনো বা গৃহ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেকে এক এক গৃহের অধিকারী হইত; তাহারা বালিতে ফুল রোপিয়া বাগান নির্ম্মাণ করিত এবং আরো কত কি করিত তাহা কিরূপে বলিব?

এক দিন বালকবালিকাগণ খেলা করিতেছে, এমন সময়ে অতি সুন্দর একটি প্রজাপতি সেখানে উড়িয়া আসিল। তাহা

দেখিয়া, মাধুরী কদম্বসেনকে কহিল—"আমাকে ঐটী ধরে দেও দাদা।" তখন কদম্বসেন ও আর তিনজন বালক প্রজাপতি ধরিতে ছুটিল; কিন্তু প্রজাপতি কি সহজে ধরা যায়? সে কখনো বালকদিগের হাতের সম্মুখে, কখনো মাথার উপরে, কখনো এ পাশে, কখনো ওপাশে পলাইতে লাগিল। বালকগণও ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিল, কতবার বালুকায় আছাড় খাইল—তখন হাসির তরঙ্গ উঠিল—আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার ছুটিল। এদিকে মাধুরী ভাইদের প্রতি চাহিয়া আছে, সহসা পেছনের দিকে তাকাইয়া দেখে—একটী অতি সুন্দর বলদ তার শরীরের রং দুধের মত, শিং দুটী যেন সোণায় বান্ধা, চক্ষু দুটী অতি উজ্জ্বল নীলবর্ণ, চাহনি অতি কোমল। বলদ বালুকার উপরে যে ফুলগুলি পড়িয়াছিল, তাহার দুই একটী খাইতেছিল ও লেজ নাড়িয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিল। মাধুরী তাহার প্রতি চাহিবামাত্র সে আনন্দে লাফাইতে লাগিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বালুতে ক্ষুরের চিহ্ন বসে না, বোধ হয় যেন ক্ষুর মাটি স্পর্শ করেই না। বলদ অগ্রসর হইয়া মাধুরীর গা চাটিয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। বালিকা প্রথমে ভয় পাইয়াছিল, চীৎকার করে করে এমন সময় বলদের স্নেহের চাহনি, তাহার মেষ শাবকের মত আহ্লাদের নাচনি এবং তাহার অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতি দেখিয়া, তাহার মনে সাহস হইল। সে তাহার রঙ্গ দেখিতে লাগিল। বলদ তাহার হাত চাটিতে ও হাত হইতে ফুল খাইতে লাগিল। তার পর সে যখন বালিকার গায়ে গা

লাগাইয়া দাঁড়ায় ও মাথা হেট করিয়া থাকে, তখন মাধুরী তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়, শিং ধরিয়া তাহার মাথা তুলিয়া দেখে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে দুইজনে এমন ভাব হইল, যেন তাহারা চিরকাল একসঙ্গে খেলা করিয়াছে; বালিকার পুতুলগুলি, হরিণ শাবক, বিড়াল ইত্যাদি যেমন ছিল, এও যেন তেমনি। বলদটী একবার দৌড়াইয়া অনেক দূর চলিয়া গেল; মাধুরীর ভয় হইল, সে আর আসিবে না; তাহার কান্না আসিল। সে হাত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল—"আয়রে বলদ, আয়।" বলদ আসিল; আসিয়া বালুকার উপর শুইয়া, তাহার হাত চাটিতে ও নানাপ্রকারে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। মাধুরী বলদকে আদর করিতে করিতে তার সোণার শিং দুটী ধরিয়া, তাহার পিঠের উপর বসিয়া পড়িল। নিমেষ মধ্যে বলদ উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়াই ছুটিল। বালিকার বড় ভয় হইল, বলদকে কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল—"ও বলদ, থাম, ও বলদ থাম।" বলদ থামিল, কিন্তু একটু থামিয়াই আবার ছুটিল এবার মাধুরী কান্দিল না, সে দেখিল বেশ আমোদ; খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। যে দিকে সমুদ্রের কূলে তার ভাইয়েরা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, বলদ সেই দিকে দৌড়িল। মাধুরী বলদের পিঠে থেকে চেঁচাইয়া কহিল—"ও দাদা, দেখ বলদে চড়েছি।" বালকেরা বিস্মিত হইয়া দেখিল বলদ বেগে দৌড়িতেছে, তার পা মাটি ছুঁইতেছে না। মাধুরী তাহার শিং দুটী ধরিয়া, তাহার পিঠে বসিয়া আছে।

তার গলায় রাশি রাশি ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মুকুট, সমস্ত শরীরে ফুলের গহনা, তাহার চুলগুলি বাতাসে উড়িতেছে, পরিশ্রমে তাহার লাল মুখখানি একটী অল্প প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মত দেখা যাইতেছে। সে হাসিতে হাসিতে কহিতেছে—"ও দাদা, দেখ বলদে চড়েছি।" বলদ বালকগণের দিকে আসিল, নিমেষ মধ্যে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া জলের ধারে পঁহুছিল ; আর দুপা গেলেই জলে পড়ে। হায় কি করিল, সর্ব্বনাশ !

এক লাফে তীর ছাড়ি ঝাঁপিল সাগরে,
ভয়াতুরা মাধুরী বসিয়া পৃষ্ঠ'পরে,
এক হস্তে শৃঙ্গ ধরি আকুল পরাণে
অন্য হস্ত বাড়াইয়া ভ্রাতাদের পানে—
'দাদা গো !' বলিয়া কান্দে ফিরায়ে বদন,
এই তার শেষ বাক্য শুনে ভ্রাতৃগণ।

বালকগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া দেখিল—

লাফে লাফে উঠিছে তরঙ্গ শূন্যোপরে
মাধুরীর দেহে ফেণ পুষ্প বৃষ্টি করে।

তখন কাতর হইয়া—

ধাইল বালকগণ পাগলের প্রায়,
কেহ গলা জলে, কেহ ডুব জলে যায়।
কিন্তু ভগ্নী কোথা ? তার বলদ-বাহন ?—
দূরে—নীল বহুদূরে সাগরে তখন।

জলে মগ্ন নহে বৃষ, জলোপরি ধায়,
নীলাকাশে ক্ষুদ্র শ্বেত বিহগের প্রায়।
ক্রমে ক্ষুদ্র—আরো ক্ষুদ্র—নাই এবে আর,
শুধু নীল জলরাশি অনন্তবিস্তার!
বালকেরা চারিজনে হতাশে তখন,
'মাধুরীরে!' বলি ভূমে হইল লুণ্ঠন।

কতক্ষণ কান্দাকাটির পর তাহারা গৃহে ফিরিয়া আসিল! রাজা অগ্রসেন অনেকক্ষণ হইল ভাবিতেছিলেন—বালকেরা মাধুরীকে লইয়া কোন্ বেলায় খেলা করিতে গিয়াছে, এখনও আসিতেছে না কেন? এমন সময় বালকগণ আসিতেছে, কিন্তু মাধুরী তাহাদের সঙ্গে নাই দেখিতে পাইলেন। বালকেরা পিতাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'মাধুরা, মাধুরী!' বলিয়া কান্দিয়া উঠিল; তাহা শুনিয়া অগ্রসেন বুঝিলেন, মাধুরীর কোন অমঙ্গল হইয়াছে। তিনি একমাত্র কন্যা মাধুরীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; পুত্রগণ অপেক্ষা, স্ত্রী অপেক্ষা, তাঁর রাজ্য—এমন কি আপনার প্রাণ অপেক্ষা কন্যাকে অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি মাধুরীর অমঙ্গল হইয়াছে বুঝিয়া সেই খানে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। সত্যধীর কান্দিতে কান্দিতে মাধুরী কিরূপে অদৃশ্যা হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিল। অগ্রসেন সে সকল কথা বিশ্বাস করিলেন না। কহিলেন—

"খেলিতে খেলিতে দূরে গেছে সে আমার,
আসিতে পারি'ছে নাকো পথ চিনে আর।

তোরা সবে অসতর্ক, যে যার খেলায়,
আছিলি মগন, দূরে ফেলিয়া তাহায়।
ওরে দুষ্ট পুত্রগণ, ওরে সত্যধীর,
এখনি এ গৃহ হ'তে হয়ে যা বাহির।
যদি কভু সঙ্গে নিয়ে বাছাকে আমার,
আসিতে পারিস্, তবে আসিবি আবার ;
নতুবা এ সর্ব্বশেষ তোদিগে বিদায়,
মাধুরীই গেল যদি, তোদিগে কে চায় ?"

পুত্রেরা পিতার পায়ে ধরিয়া কত মিনতি করিল ; কিন্তু পিতা তাহা শুনিলেন না। তিনি বার বার কেবল এই কথাই বলিলেন—

"মাধুরীই গেল যদি, তোদিগে কে চায় ?"

অতএব বাধ্য হইয়া কদম্বসেন, পুণ্যসেন, কালিকেশ ও সত্যধীর রাজপুরী হইতে বিদায় হইলেন ; রাণী শান্তশীলা ও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি রাজাকে কহিলেন—

"পুত্র কন্যা হারাইয়া কেন রহি আর ?
আমিও চলিয়া যাই সন্ধানে কন্যার।
মাধুরীকে নাহি পাই, আছে পুত্রগণ
তাহাদের মুখ দেখে রাখিব জীবন।"

রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা সমুদ্রতীরে গেলেন। সেখান হইতে তীরপথে ক্রমাগত যাইতে লাগিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে কদম্বসেন, বাম পার্শ্বে পুণ্যসেন, মধ্যে রাণী শান্তশীলা,

পশ্চাতে কালিকেশ ও সত্যধীর। যাহাকেই পথে দেখিতে পান, তাহাকেই হয় রাজপুত্রগণের মধ্যে কেহ, নয় রাণী নিজে, না হয় সত্যধীর জিজ্ঞাসা করেন—

"শ্বেত বলদের পৃষ্ঠে করি আরোহণ
এ পথে বালিকা কেহ করেছে গমন?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া লোকে অবাক্ হইত। কুমারী আর সকল প্রকার বাহন থাকিতে, বলদের পিঠেই বা কেন চড়িবে, আর যাবেই বা কোথায়, এবং কেনই বা কয়েকটী বালক সঙ্গে লইয়া একটী লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না স্ত্রীলোক তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য পথে পথে বেড়াইবে, ইহা তাহারা সহসা বুঝিতে পারিত না। যাহারা উপহাস-প্রিয়, তাহারা উপহাস করিয়া বলিত—

"বলদের পিঠে চড়ি বুঝি বা কৈলাসে গেছে
শিবের বৃষের পাশে শ্মশানেতে চরিতেছে।"

কেহ কেহ বা শান্তশীলার ও বালকগণের সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ ও তাঁহাদের রাজশ্রী দেখিয়া, তাঁহারা যে বড়লোক ইহা বুঝিতে পারিত; বুঝিয়া দুঃখিতের ভাবে কহিত—

"আমরা তো দেখি নাই কোন বালিকায়,
শ্বেত বলদের পৃষ্ঠে চড়িয়া বেড়ায়।"

এই বলিয়া তাহারা এক দৃষ্টে তাঁহাদিগের প্রতি তাকাইয়া থাকিত। কদম্বসেন কখনো কখনো বিশেষ করিয়া বলদের বর্ণন করিতেন—

সে অতি সুন্দর বৃষ দুধের বরণ,
শৃঙ্গ দুটী যেন তপ্ত স্বর্ণের গঠন।"

তাহা শুনিয়া কোন কোন কৃষক বিস্মিতের স্বরে কহিত—

"দেখেছি দু'এক বৃষ দুধের বরণ,
সোণার গঠন শৃঙ্গ দেখিনি কখন।"

যদি শান্তশীলা মাধুরীর কথা বিশেষ করিয়া বলিতেন—

"পরমাসুন্দরী কন্যা মাধুরী আমার,
বয়স বৎসর সাত আট হ'বে তার ;
সমস্ত শরীরে নানা ফুলের ভূষণ,
পরিধানে মহামূল্য সুন্দর বসন,"

তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোক হয় ত বলিত—

"এমন সুন্দর মেয়ে রক্ষকবিহীন
ছেড়ে দিয়ে ভাল কাজ করনি, বহিন ;
দেবতার দৃষ্টি থাকে এদের উপর,
কে জানে সে বৃষ কা'র এসেছিল চর ?"

এই বলিয়া আবার হয়তো কহিত—"আমরা তোমার মেয়ে দেখিনি, বাছা ; সে এপথে আসেনি।" মাধুরীকে বলদ সমুদ্র-পথে লইয়া গিয়াছিল ; অতএব তাঁহারা নাবিক ও ধীবর লোক দেখিলেই তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন। কখনো কদম্বসেন কোন নাবিককে কহিতেন—

"নাবিক, সমুদ্রপথে এক বালিকায়
দেখেছ বলদ পৃষ্ঠে অতি দ্রুত যায় ?"

নাবিক হাসিয়া উত্তর করিত—

সমুদ্রে যাইতে লোকে পোতে চড়ি যায়
বলদের পিঠে যেতে শুনিনি কাহায় !
স্বপনে বা দেখিয়াছ হেন চমৎকার,
সুস্থির হইয়া ভেবে দেখ একবার !”

এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। তাঁহারা প্রথমতঃ আপনাদের গহনাপত্র এক একখানি বিক্রয় করিয়া, আপনাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে যখন তাহা ফুরাইল, তখন তাঁহারা আপনাদের পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্রগুলি বিক্রয় করিয়া সামান্য কাপড় ও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে আর কিছুদিন চলিল। শেষে তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া, কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। এখন শান্তশীলাকে তাঁহার লক্ষ্মী-শ্রী ব্যতীত আর কিছু দেখিয়া, রাজরাণী বলিয়া জানিতে পারা যাইত না। রাজপুত্রগণকেও মলিন ও দীনবেশে কেহ রাজপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। তাঁহারা কখনও কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া তাহার কৃষির সাহায্য করিতেন, শস্য কাটিতেন, নয় উহা বহিয়া গৃহে আনিতেন, না হয় অন্য কিছু করিতেন; শান্তশীলাও কৃষকপত্নীদের হাতের কাজ এগিয়ে দিতেন। কৃষক ও কৃষকপত্নীরা তাহাদিগকে যত্ন করিয়া দুই তিন দিন পালন করিত ও তাঁহাদের কাহিনী শুনিয়া চক্ষুর জল ফেলিত। কেহ শান্তশীলাকে কহিত—

"তুমি, বাছা, রাজরাণী ; সাজে কি তোমার
সুখের শরীরে পথকষ্ট এ প্রকার ?
রহ আমাদের হেথা সহ পুত্রগণ,
ষষ্ঠীর প্রসাদে তারা আছে তিন জন ;
মেয়েটী হারায়ে গেছে, কি আর করিবে ?
ফিরে আসে আসিবে সে, না আসে, সহিবে।
মানুষের সব সয়। সন্ন্যাসীর প্রায়
দেশে দেশে বেড়াইলে কি হ'বে উপায় ?"

কৃষকপুত্রেরা কদম্বসেনকে কহিত—

"তুমি ভাই, মাতা আর ভ্রাতৃগণ লয়ে
আমাদের গৃহে থাক আমাদের হয়ে।
করেছ ভগ্নীর তব বহু অন্বেষণ,
কত আর দেশে দেশে করিবে ভ্রমণ ?"

কিন্তু বলিলে কি হয় ? তাঁহারা কোনও স্থানে স্থির হইতে পারিতেন না। বড় পরিশ্রম হইলে, কিম্বা উদরান্নসংস্থানের জন্য দুই তিন দিন কোথায়ও থাকিয়া, আবার রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেন।

এইরূপে কেবল বহুদিন কাটিল তাহা নহে, বহু বৎসর কাটিয়া গেল। কদম্বসেনের বয়স এখন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, ভাইয়েরা তার চার ছয় বৎসরের ছোট। রাণী শান্তশীলা এখন প্রায় বৃদ্ধা হইয়াছেন। শোকে, দুঃখে ও পথের কষ্টে তাঁর শরীর দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়াছে ; তিনি এখন কদম্বসেন ও পুণ্যসেনের

স্কন্ধে ভর করিয়া চলেন। ভাইয়েরা এখনও যদিও দিবারাত্রি ভগিনীর অনুসন্ধান করিতেছেন, যদিও যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"শ্বেত বলদের পৃষ্ঠে করি আরোহণ
এ পথে বালিকা কেহ করেছে গমন ?"

তথাপি, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে, তাঁহাদের কাহারই মাধুরীর কথা ভাল করিয়া মনে নাই ; সে কি আজকার কথা ! মাধুরী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা, এখন থাকিলে কুড়ি বাইশ বৎসরের যুবতী হইত। এই কথা ভাবিয়া তাঁহারা পথপার্শ্বস্থ লোকদিগকে কখনও জিজ্ঞাসা করেন—

"শ্বেত বলদের পৃষ্ঠে করি আরোহণ
এ পথে **কামিনী** কেহ করেছে গমন ?"

আগে লোকদিগকে বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে বলিতেন—

"আমরা খেলিতেছিনু সাগরের তীরে
বসাইয়া বালিকায় বালুর মন্দিরে ;
সুন্দর পতঙ্গ এক আসিল তথায়,
আমরা ছুটিয়া যাই ধরিতে তাহায়"---

ইত্যাদি কথা বলিতেন, কিন্তু এখন সে সব খেলা ধূলার কথা বলিতে লজ্জা করে ; হঠাৎ বলিয়া ফেলিলে লোকে হাসে, বলে

"এগুলো এ বলে কি গো ? বুঝিবা পাগল,
কে খুলিয়া দিল হাত পায়ের শিকল ?

বলে কি না, বালি দিয়া, পতঙ্গ ধরিয়া,
খেলিতে খেলিতে এক বালিকাকে নিয়া,
শ্বেত বৃষ আসি এক পিঠে তুলি তায়
সিন্ধুর উপর দিয়া গিয়াছে কোথায় ?—

বাপরে ! অনেক পাগলের কথা শুনিয়াছি, এমন ত আর কখনও শুনি নাই।" রাজকুমারেরা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অধোমুখে চলিয়া যাইতেন। তাঁহারা এখন রাজরাণী ও রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন না ; বড় লজ্জা হইত ; আর দিলেই বা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন ? বহু বৎসর পথে পথে বেড়াইয়া, কদর্য্য আহার করিয়া, ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া, কখনও বা অনাহারে, অনিদ্রায় থাকিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহাদের রাজশ্রী সহজে লোকের দৃষ্টিগোচর হইত না। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—"তোমরা কে ?" তবে তাঁহারা কহিতেন—

"আমরা গরিব লোক, ঘরবাড়ী নাই ;
দুটী খেতে চাই, রাত্রে রহিবারে চাই।"

কিন্তু কদম্বসেনের আর ভাল লাগে না। তিনি মাকে, ভাইদিগকে ও সত্যধীরকে কহিলেন—"আমরা আর কতকাল পথে পথে বেড়াইব ? মাধুরীর অন্বেষণে আমরা এতগুলি জীবন নষ্ট করিতে বসিয়াছি ; অথচ মাধুরী হয় ত সমুদ্রে ডুবিয়াছে, কি বাঁচিয়া থাকিলেও আমাদিগকে ভুলিয়া নিশ্চিন্তে আছে। মাধুরীর নামমাত্র আমার মনে আছে, আর কিছু বড় মনে পড়ে না। আমি ত আর তা'র অন্বেষণে জীবন নষ্ট করিতে চাই না। পিতা

গৃহে ফিরিতে মানা করিতেছেন; গৃহে না গেলাম। এস, আমরা এইখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করি। তখন শান্তশীলা কহিলেন—

"মাধুরীকে মনে যদি নাহি, বাছা, আর
আর ভ্রমিওনা তবে সন্ধানে তাহার;
হেথা বাস কর করি গৃহ বিরচন;
আশীর্ব্বাদ করি, সুখে রহ অনুক্ষণ।
আমি আজ (ও) ভুলিবারে পারিনি কন্যায়
এখন (ও) পৃথিবীময় খুঁজিব তাহায়;
জীবনে না হয়, দেহ হইলে বিলয়
স্বর্গধামে দেখা তা'র হইবে নিশ্চয়।"

অতএব কদম্বসেন সেই স্থানে রহিলেন; পুণ্যসেন, কালিকেশ ও সত্যধীরের সাহায্যে সেখানে একখানি গৃহ প্রস্তুত করিলেন। মাতা ও ভ্রাতৃগণকে বিদায় দিবার কালে কহিলেন—

"যদিও ভগ্নীকে আমি ভুলিয়াছি প্রায়,
পর্য্যটন ছেড়ে দিয়ে রহিনু হেথায়,
তথাপিও মাধুরীর করিব সন্ধান
যথাশক্তি যতদিন দেহে রহে প্রাণ।
পুণ্যসেন, কালিকেশ, জননী আমার,
যদি অন্বেষণে কভু সাঙ্গ হয় তা'র,
এপথে আসিও; ফিরে দিও দরশন
তোমাদের পথ চেয়ে রাখিব জীবন।"

ইঁহারা চলিয়া গেলে কয়েক মাসের মধ্যে সেখানে অন্য পথিকেরা আসিল। তাহারা কদম্বসেনের গৃহের চতুষ্পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল। তারপর আরও অনেকে আসিয়া সেইরূপ করিল। ক্রমে সেখানে একটী সুন্দর নগর স্থাপিত হইল। আর কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই নগরের চারিদিকে বহুসংখ্যক গ্রাম, পল্লী, ইত্যাদি বসিয়া এক বৃহৎ রাজ্য গঠিত হইল। তখন রাজ্যের লোকেরা একত্রিত হইয়া কদম্বসেনকে তাহাদের রাজা করিল; তাহারা কহিল—

"সমস্ত শরীরে তব রাজার লক্ষণ,
তুমি শ্রীকদম্বসেন রাজার নন্দন;
এ নব রাজ্যের, দেব, লহ তুমি ভার
পৃথিবীতে যশোরাশি করহ বিস্তার।"

কদম্বসেন রাজসিংহাসনে বসিলেন; বসিয়াই রাজ্য মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে—

"শ্বেত বলদের পৃষ্ঠে করি আরোহণ
একটী রমণী যদি করে আগমন,
যে কেহ দেখিবে তায় করিবে আদর,
আনিবে যতন করি রাজার গোচর!"

এদিকে পুণ্যসেন ও কালিকেশের স্কন্ধে ভর করিয়া রাণী শান্তশীলা পথ চলেন, পাছে পাছে সত্যধীর। রাজপুত্রদের মুখে সেই প্রশ্ন—

"শ্বেত বলদের পৃষ্ঠে করি আরোহণ
এ পথে কামিনী কেহ করেছে গমন ?"

কিন্তু যখন রাণী জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন—

"এ পথে বালিকা কেহ করেছে গমন ?"

মায়ের কাছে মাধুরী এখনও বালিকা।

এইরূপে আর এক বৎসর কাটিল; তখন এক মনোরম বনস্থানে উপস্থিত হইয়া পুণ্যসেন কহিলেন—

"মা, আমি পারি না আর, ভাই কালিকেশ,
কতকালে হবে আর ভ্রমণের শেষ ?
রাজার তনয় আমি, রাজ্য অধিকারী,
আজ কতকাল হ'ল ভিক্ষাবৃত্তি করি ;
কবে পরিশোধ হবে মাধুরীর ঋণ,
শাস্তির অবধি আর হ'বে কোন্ দিন ?
এস, করি এই স্থানে গৃহ বিরচন
বিশ্রাম সুখেতে করি জীবন যাপন।"

শুনিয়া শান্তশীলা কহিলেন—

"স্নেহের যে ঋণ আমি ধরি তনয়ার
জীবন থাকিতে শোধ হ'বে না তাহার।
এই স্থানে, পুত্র, তুমি কর অবস্থান,
বিধাতা করুণ তব কল্যাণ বিধান।
আমি, আর কালিকেশ, আর সত্যধীর,
পুনরায় পথে, পুত্র হইব বাহির ;

যতদিন শক্তি থাকে, দেহেতে জীবন
করিব পৃথিবীময় তা'র অন্বেষণ।"

তখন পুণ্যসেন, কালিকেশ ও সত্যধীর তিনজনে মিলিয়া পুণ্যসেনের জন্য সুন্দর গৃহ প্রস্তুত করিলেন। পুণ্যসেন সেই গৃহে রহিলেন! মা, ভাই ও সহচরকে বিদায় দিবার সময় তিনিও চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কহিলেন—

"মা, আমি বিশ্রাম হেতু রহিনু এখানে,
তবুও রহিব সদা ভগ্নীর সন্ধানে।
জীবনের ব্রত যদি হয় সমাপন,
ফিরে এসে পুণ্যসেনে দিও দরশন।"

কিছুকাল মধ্যে এস্থানেও অন্যান্য গৃহশূন্য পথিকেরা আসিয়া, পুণ্যসেনের গৃহের চতুর্দ্দিকে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে তথায়ও একটী গ্রাম ও গ্রাম হইতে নগরী সংস্থাপিত হইল; নগরীর চতুর্দ্দিকে রাজ্য গঠিত হইল। রাজ্যের লোকেরা পুণ্যসেন যে রাজপুত্র, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকেই নূতন রাজ্যের রাজা করিল। তিনি রাজা হইয়া দেশে দেশে দূত পাঠাইলেন; উপদেশ দিয়া দিলেন, তাহারা যেন অতি যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করে—

"কেহ দেখিয়াছে কিনা কোথায় (ও) কখন
শ্বেত বৃষ আরোহণে নারী এক জন।"

অনন্তর শান্তশীলা কালিকেশ ও সত্যধীরের স্কন্ধে ভর করিয়া, আর তিন চার মাসকাল ভ্রমণ করিলেন। এই কালের শেষে

আর একটী সুন্দর স্থানে উপস্থিত হইলে সত্যধীর কহিলেন—"আমি আর পারি না ; আমি এইখানে থাকিয়া বিশ্রাম করি।—

প্রতি নিশি প্রভাতেই 'দুর্গা দুর্গা' বলি
যষ্টি হাতে লয়ে পথে বাহিরিয়া চলি ;
আর তো চলে না মন, চলে না চরণ,
ইচ্ছা করি, বিশ্রাম করিব কতক্ষণ।"

অতএব কালিকেশ ও সত্যধীর দুই জনে মিলিয়া একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। সত্যধীর সেই গৃহে বাস করিবেন। বিদায়ের সময় শান্তশীলা তাঁহাকে কহিলেন—

"সত্যধীর, গর্ভে তোমা' করিনি ধারণ,
তথাপি আছিলে তুমি পুত্রের মতন।
সুখে থাক, শান্তিসুখ কর আস্বাদন,
মাধুরীকে, আমাদিগে রাখিও স্মরণ।"

সত্যধীর কহিলেন—

"আপনার পিতা, মাতা. ভ্রাতা, ভগ্নীগণ
ত্যজি তোমাদের সনে কাটানু জীবন ;
মাধুরীর নাম মুখে ছিল অনিবার,
তোমাদিকে, তাকে ভোলা সম্ভব কি আর ?
আমি রহিলাম, যদি ফের, মা, কখন
তোমরা অনাথে হেথা দিও দরশন।"

সত্যধীরের গৃহের চতুর্দ্দিকেও নগর ও রাজ্য সংস্থাপিত হইল এবং রাজ্যের লোকেরা তাঁহাকেই রাজা করিল। তাহারা কহিল—

"যদিও না হও তুমি রাজবংশধর,
অতি উচ্চ, প্রেমময় তোমার অন্তর!
তুমি রাজা হও, লহ রাজ সিংহাসন,
পিতার মতন কর প্রজার পালন!

সত্যধীর রাজা হইয়া আপনার রাজ্য মধ্যে বহু অতিথিশালা স্থাপন করিলেন ও তথাকার ভৃত্যগণকে এই আদেশ করিলেন—

"আহারপানের দ্রব্য সদা সর্ব্বক্ষণ,
প্রস্তুত রাখিবে গৃহে ভুলো না যেমন।
যদি শ্বেত বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করি
তোমাদের দৃষ্টিপথে আসে কোন নারী,
অভ্যর্থনা অবিলম্বে করিবে তাঁহার
শ্রান্তিদূর করাইয়া করা'বে আহার;
তখনি আমাকে বার্ত্তা করিবে প্রেরণ
আমি যেয়ে অতিথিকে করিব দর্শন।"

এ আজ্ঞার এই ফল হইল যে মাধুরী তো আসিল না, তাহার জন্য প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন প্রতিদিন শত শত পথিক ও দরিদ্র লোকে ভোজন করিয়া রাজা সত্যধীর ও রাণী মাধুরীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিত মাধুরী সত্যধীরের রাণী—হারাইয়া গিয়াছেন।

এদিকে কালিকেশের স্কন্ধে ভর করিয়া রাণী শান্তশীলা আরও কিছুদিন পথ চলিলেন। তার পর আর তাঁহার চলিবার শক্তি রহিল না। পথশ্রমে, অনাহারে, কদর্য্য দ্রব্য আহারে, অনিদ্রায়,

রৌদ্রবৃষ্টিতে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়াছিল, তিনি অতি কষ্টে দু’পা চলিয়াই বসিয়া পড়িতেন। শেষে একদিন মৃতের ন্যায় রাস্তায় পড়িয়া গেলেন, আর উঠিতে পারেন না। কালিকেশ তাঁহাকে অতি যত্নে কোলে তুলিয়া নিকটবর্ত্তী এক গৃহস্থের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে সেইখানে নানা প্রকার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাণী কিছুদিনের মধ্যে অনেক পরিমাণে সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিশ্রমের শক্তি আর রহিল না। তিনি কান্দিতে লাগিলেন—

"মা মাধুরি, তোর আর হ’ল না সন্ধান—
মিটিল না কোন আশা—জুড়াল না প্রাণ।"

কালিকেশ বলিলেন—"মা, আপনি এইখানে থাকুন; যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি তত দিন মাধুরীর অন্বেষণ করিব; মাধুরীর জন্যে নয়—তাকে আমার বড় মনে পড়ে না—আপনার জন্য। যদি সে পৃথিবীতে থাকে ও তাহাকে কখনও পাই আপনাকে আনিয়া দেখাইব, আপনার প্রাণ জুড়াইবে।" গৃহস্থ কহিল—"মা, আপনি এখানে থাকুন, আমি পুত্রের ন্যায় আপনার সেবা করিব; রাজপুত্র আপনার কন্যার অনুসন্ধানে যাউন।" সেই পরামর্শই স্থির হইল। গৃহস্থ কালিকেশকে কহিল— "আপনি সিতাচল পর্ব্বতে গমন করুন; সেখানে পর্ব্বতের গর্ভে চারণী নামে এক যোগীনী বাস করেন। তাঁহাকে কেহ কখনও দেখে নাই; এক ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ আছে, সেই পথে তাঁহার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ তাঁহাকে বিনীত ভাবে কোন

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তিনি প্রসন্না হইলে তাহাকে উত্তর দেন। উত্তর সেই সুড়ঙ্গপথে শুনা যায়। আপনি এরূপ দিগ্‌বিদিগ্‌ শূন্য হইয়া ভগ্নীর অনুসন্ধান করিলে কোন বিশেষ ফল হইবে বোধ হয় না। আপনি যাইয়া সর্ব্বজ্ঞা চারণীকে জিজ্ঞাসা করুন—"দেবি, মাধুরীকে পাইব কি না?" যদি তিনি উত্তর করেন—'পাইবে', তবে জিজ্ঞাসা করিবেন—'কোথায় কিরূপে পাইব।' চারণী প্রসন্না হইয়া আপনার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিলে আপনার মনের বাসনা পূর্ণ হইতে পারিবে। আপনি অবিলম্বে সিতাচলে গমন করুন।"

এই কথা শুনিয়া কালিকেশ সিতাচলের দিকে চলিলেন। বহুদিন পর্য্যটনের পর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অতি উচ্চ পর্ব্বত, তার পাদদেশে গভীর বন; বনের মধ্যে সুড়ঙ্গের মুখ। তিনি কিছুকাল বিশ্রামের পর নির্ঝরিণীর জলে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং গলবস্ত্র হইয়া সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে কহিলেন—

"যোগিনী চারণি, দেবি, প্রণমে তোমায়
দাসাধম কালিকেশ; কৃপাভিক্ষা চায়—
শ্বেত বলদের পৃষ্ঠে করি আরোহণ
মাধুরী ভগিনী কোথা করেছে গমন;
তুমি, মা, সকলি জান কি কহি বিস্তার,
তা'কে কি এ ধরাতলে পাইব আবার?"

চতুর্দ্দিক নীরব। তখন পশুপক্ষিগণ কলরব বন্ধ করিয়াছিল,

বায়ু বহিয়া বৃক্ষপত্রগুলির মধ্যে আর শব্দ করিতেছিল না, নির্ঝরিণীটী পর্য্যন্তও যেন তার গতি স্থগিত করিয়া চারণী কি উত্তর দেন, শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। তখন সুড়ঙ্গ-পথে উত্তর হইল—

"মাধুরীকে ধরাতলে পাবে, কালিকেশ।"

এই উত্তর শুনিয়া কালিকেশের হৃদয় অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল; পশুপক্ষীগুলি যেন আহ্লাদে কলরব করিয়া উঠিল, বায়ু বহিয়া বৃক্ষপত্রগুলিকে নাচাইল, নির্ঝরিণী কল কল ধ্বনি করিতে করিতে সে আনন্দের সংবাদ লইয়া ছুটিল। তখন রাজপুত্র আবার বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথায়, কিরূপে পা'ব কহ, মা, বিশেষ।"

আবার সুড়ঙ্গ-পথে গম্ভীর স্বরে উত্তর আসিল—

"ধেনুর পশ্চাতে, পুত্র করহ গমন,
মনোরথ পূর্ণ হবে, করিনু জ্ঞাপন।

ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব—একি কথা? সেই ধেনুই বা কোথায়? কালিকেশ মনোমধ্যে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। চারণীর অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন—তিনি বা ভুল শুনিয়াছেন। বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তিনি সুড়ঙ্গমুখে আবার পূর্ব্বের প্রশ্ন করিলেন—

"কোথায়, কিরূপে পা'ব কহ, মা, বিশেষ।"

কিন্তু তিনি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না; পরন্তু চতুর্দ্দিক হইতে সিংহব্যাঘ্রাদি বন্য পশুগণের ভয়ানক

গর্জ্জন শুনা যাইতে লাগিল, ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল ; পশু-গুলির চীৎকারে ও নিঝ রিণার কল্লোলে কর্ণ বধির হইতে লাগিল। কালিকেশ বুঝিলেন চারণী আর কোন কথা কহিতে ইচ্ছা করেন না। তখন ভক্তিভরে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বনমধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন অল্প দূরে একটী সুলক্ষণা গাভী শুইয়া রোমন্থন করিতেছে। তখন কালিকেশ বুঝিলেন, এই ধেনুকেই অনুসরণ করিতে হইবে। গাভীও তাঁহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল ; রাজপুত্র তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন—

শ্বেতবর্ণা কামধেনু মৃদু মন্দ যায়,
কভু দাঁড়াইয়া স্থির দুর্ব্বাদল খায়।
নম্রভাবে কালিকেশ করেন সরণ,
বিশ্রাম লভনে গাভী দাঁড়ায় যখন।

এইরূপে বহুদিন চলিলেন। গাভীর দিবারাত্রি বিশ্রাম নাই, রাজপুত্রেরও বিশ্রাম নাই। তাঁহার যখন ক্ষুধা হয়, গাভী কিরূপে বুঝিতে পারে—

দাঁড়াইয়া অবিরল দুগ্ধ করে দান,
ক্ষুধা দূরে যায় সেই সুধা করি পান।

রাস্তায় যাইতে যাইতে গাভী কোন গ্রামে কি নগরের মধ্য দিয়া গেল না, বড় বড় প্রান্তর, পাহাড়, বন ইত্যাদি অতিক্রম করিতে লাগিল। কখনও কালিকেশের সহিত দুই চারি জন পথিকের দেখা হইল ; তাহারাও মন্ত্রমুগ্ধের মত ধেনুর অনুসরণ

করিতে লাগিল। রাজপুত্র এই সঙ্গীদিগকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন ও তাহাদের সহিত বার্ত্তালাপে অনায়াসে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গাভী কি চিরদিন চলিবে? কোথাও কি থামিবে না? এক বৎসরের অধিককাল অতীত হইয়াছে কালিকেশ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন, আর কত দিন এ ভাবে যাইবে?

একদিন দুপ্রহরকালে গাভী সহসা এক বনের প্রান্ত ভাগে একটী বৃক্ষতলে শুইল; ইতিপূর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে সে আর কখনো শোয় নাই! কালিকেশ ও তাঁহার সঙ্গিগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। দুপ্রহর কালের রৌদ্র; তাঁহাদের শরীর অত্যন্ত তপ্ত হইয়াছিল ও পিপাসায় তাঁহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল—তাঁহারা গাভীর পশ্চাতে বৃক্ষতলে কিছু দূরে বসিলেন। অনতিদূরে নানাবিধ ফলের বৃক্ষে ফল সকল পাকিয়া ঝুলিতেছিল এবং নীচে একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বহিতেছিল। কালিকেশ ঘাসের উপর শুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গিগণ কহিল—"রাজকুমার, আপনি এই খানে বিশ্রাম করুন, আমরা আপনার জন্য ফল ও জল লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তাহারা ঝরণার দিকে চলিয়া গেল। কালিকেশ আলস্যবশে চক্ষু মুদিয়াছেন, নিদ্রা আসে আসে এমন সময় কাতর চীৎকার ও ক্রন্দনের শব্দ ও সর্পের গর্জ্জনের মত গর্জ্জন তাঁহাকে চমকিত করিল। তিনি এক লম্ফে উঠিয়া কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া চক্ষু মুছিয়া চাহিলেন এবং শুনিলেন, নির্ঝরের দিক্

হইতে শব্দ আসিতেছে। দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলেন—

ভীম অজগর, তার বিপুল শরীর
গর্জ্জে ভয়ানক রবে উত্তোলিয়া শির ;
পাটি পাটি তীক্ষ্ণ দন্ত ভীষণ আকার,
চক্ষু হ'তে অগ্নিশিখা বাহিরিছে তার ;
লেজের আঘাতে বৃক্ষ ভাঙ্গে সমুদয়
ফণার আঘাতে যেন ভূমিকম্প হয়।

কালিকেশ দেখিলেন, নাগ তাঁহার সঙ্গীসকলকে গ্রাস করিল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ুবেগে ছুটিয়া আসিলেন এবং ঢাল তরবার সহিত এক লম্ফে অজগরের গলার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে অমনি মুখ বন্ধ করিল বটে, কিন্তু রাজপুত্র তরবার দ্বারা তাহার কণ্ঠে এমন ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে লাগিলেন যে, সে যাতনায় অস্থির হইয়া মুখ খুলিল ও ভয়ানক গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কালিকেশ সর্পের গলদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ও রক্তাপ্লুত শরীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। নাগ গর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। তখন আকাশবাণী হইল :—

"এই বীরদন্ত নাগে করিয়া হনন
রাখিলে অতুল কীর্ত্তি, হে রাজনন্দন ;
এই বনপ্রান্তে এই নির্ঝর ভিতর
বহুশত বর্ষ বাস করেছে পামর।

কত কোটি জীব জন্তু করেছে সংহার,
ধ্বংস করিয়াছে কত সোণার সংসার।
এবে এর দন্তগুলি করিয়া স্খলন
ওই প্রান্তরের মাঝে করহ বপন।"

কালিকেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলেন : একবার বোধ হইল যেন গাভীর দিক্ হইতে কথার শব্দ আসিতেছে ; কিন্তু কৈ ? গাভী তো নিশ্চিন্তে শুইয়া রোমন্থন করিতেছে ; এও কি সম্ভব যে গাভী কথা কহিল ?

যাহাই হউক, তিনি দৈব আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য তরবার দ্বারা মৃত বীরদন্ত নাগের দাঁতগুলি খুলিতে লাগিলেন। সে দাঁত খোলা কি সহজ ব্যাপার ? বহু পরিশ্রমে ও বহুক্ষণে আট দশটী মাত্র খুলিলেন এবং তরবারির দ্বারা প্রান্তরের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে উহা বপন করিলেন। পরে তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বনের দিকে চলিলেন। বনমধ্যে উপস্থিত হইতেই বৃক্ষ সকল তাঁহার পদতলে শত শত সুমিষ্ট ফল ও মস্তকে ফুলরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। নির্ঝর তাহার গতিপথ পরিত্যাগ করিরা তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া বহিতে লাগিল ; মৃদু মধুর সুরভিবায়ু তাঁহার শরীর শীতল ও মন প্রফুল্ল করিতে লাগিল ; তাঁহার যেন বোধ হইল পক্ষিমুখে গান হইতেছে—

"সুখে থাক, কালিকেশ, রাজার নন্দন,
বীরদন্তে নাশ করি ধরণীর ভার হরি
দেবতার প্রিয়কার্য্য করিলে সাধন।

লহ এই উপহার নানা ফলফুলভার
তোমার কামনা, বীর, হউক পূরণ।”

রাজপুত্র তৃপ্তি পূর্ব্বক ফল ভক্ষণ ও নির্ঝরের জল পান করিয়া সুস্থ ও সবল হইয়া যেখানে বীরদন্ত নাগের দাঁতগুলি রোপিয়াছিলেন সেইখানে আসিলেন ; আসিতে আসিতে ভাবিতে ছিলেন—“সাপের দাঁত বুনিলে কোনও কিছু হয় এত আমার ধারণা ছিল না ; যাহা হউক, দেবতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি ; এখন দেখি গিয়া কি শস্য ফলিল!” আসিয়া দেখেন—

রোপিত দন্তের স্থানে শিশিরের প্রায়
কি যেন কি ঝিকিমিকি করে দেখা যায়—
সে গুলি বর্শার ফলা শাণিত বিমল,
ভূমি ভেদি ক্রমাগত উঠিছে কেবল ;
ক্রমে শিরস্ত্রাণ উঠে, মস্তক তৎপর,
শরীর উঠিতে ভূমি ফাটে চর্ চর্।
লাফে লাফে উঠে সবে দন্তবীরগণ,
সিংহনাদে মেদিনী কাঁপায় অনুক্ষণ।
ভূমে পদাঘাত করে, দন্ত কিড়িমিড়ি,
জবাফুল তুল্য অক্ষি পড়িছে উপাড়ি।
ক্রোধে চীৎকারিরা কহে “মার মার মার
কোথা শত্রু ? কোথা শত্রু ? করিব সংহার।”
বিদ্যুৎচমক যেন অসির ঘূর্ণন
শন্ শন্ শন্ রবে পূরিল গগন।

কেবল যে বীরগণই উঠিল তাহা নহে। নিমেষ কাল পরে যে সকল গর্ত্ত হইতে তাহারা উঠিয়াছিল, সেই সকল গর্ত্ত হইতে ভেরী তূরী ইত্যাদি হস্তে লইয়া রণবাদ্যকরগণও উঠিল; উঠিয়া ঘোর রবে বাদ্য আরম্ভ করিল। কালিকেশ বিস্মিত হইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছেন এমন সময়ে আবার আকাশবাণী হইল—

"কালিকেশ, দাঁড়াইয়া যেথা বীরগণ
মধ্যস্থলে শিলাখণ্ড কর নিক্ষেপণ।"

রাজকুমার একখণ্ড প্রস্তর লইয়া যেখানে যোদ্ধারা দাঁড়াইয়াছিল, তার মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ—

একযোগে বীরগণ করে উল্লম্ফন,
একযোগে সিংহনাদ করিল ভীষণ,
একযোগে ভেরী, তূরী বাজে ভয়ঙ্কর,
প্রতিধ্বনিপরিপূর্ণ হইল প্রান্তর,
একযোগে বীরগণ তুলি তরবার
যে যারে সম্মুখে পায় করিছে প্রহার!

কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধের পর যখন কেবলমাত্র পাঁচজন যোদ্ধা অবশিষ্ট রহিল, তখন রাজপুত্র আবার দৈববাণী শুনিলেন—

"আজ্ঞা কর, বীরগণ সাঙ্গ করে রণ,
পুরী বিরচণ করে তোমার কারণ।

শুনিয়া তিনি আপনার তরবার উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই বীরগণকে আদেশ করিলেন—

"ক্ষান্ত হও, বীরগণ, সাঙ্গ কর রণ,
আমার কারণে পুরী কর বিরচণ।"

তখন সেই ভূমিজাত বীরেরা তরবার কোষে রাখিয়া হাতজোড় করিয়া কালিকেশকে প্রণাম করিল ও কহিল—

"আমরা তোমার ভৃত্য, রাজা কালিকেশ,
সর্ব্বদা পালিব যাহা করিবে আদেশ।"

তাহারা তাহাদের তরবার দ্বারা মৃত্তিকা হইতে বড় বড় পাথর তুলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রিত করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইলে রাজকুমার তাহাদিগকে কহিলেন—"তোমরা আজ বিশ্রাম কর, কাল প্রভাতে পুরীনির্ম্মাণ আরম্ভ করিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিশ্রাম করিতে গেল।

কিন্তু পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে কালিকেশ দেখিলেন—শ্বেত নীল, পীত ইত্যাদি বহু বর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত এক অতি সুন্দর রাজপুরী সূর্য্য কিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তিনি ও তাঁহার অনুগত যোদ্ধাগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুরীর সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে উহাতে প্রবেশ করিলেন। এক অতি মনোরম গৃহের দ্বার মোচন করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন, চারিটী পরমাসুন্দরী যুবতী একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। রাজপুত্রকে দেখিবামাত্র তাহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া অগ্রসর হইলেন; তাঁর মুখে হাসি, চক্ষে জল, তিনি কে? কালিকেশ চিনিলেন—

তিনি প্রিয়া সহোদরা মাধুরী ললনা,
হরি, হরি ! এতদিনে পূরিল কামনা !

তারপর ভ্রাতাভগিনীতে স্নেহ সম্ভাষণ ইত্যাদি হইল। সুখের প্রথম আবেগ থামিয়া গেলে মাধুরী কালিকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মা কেমন আছে, দাদা, পিতা বা কেমন,
বড় দাদা, মেজ দাদা কোথায় এখন ?
আর সেই সত্যধীর, বাল্যসহচর,
সে কোথা কেমন আছে কহ তা বিস্তর।"

রাজপুত্র কহিলেন—তাঁরা সকলেই ভাল আছেন, আমি এখনই তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতেছি, শীঘ্রই তাঁহাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার পাঁচ বীর অনুচরকে ডাকিলেন। একজনকে সিকতাপুরে পিতার নিকট একজনকে মাতার নিকট, একজনকে কদম্বসেনের নিকট, একজনকে পুণ্যসেনের নিকট, এবং একজনকে সত্যধীরের নিকট পাঠাইলেন। কহিয়া দিলেন—

"অবিশ্রাম দ্রুতগতি করিবে গমন
মঙ্গল সংবাদ এই করিতে জ্ঞাপন ;
কহিবে 'মাধুরী রত্ন হয়েছে উদ্ধার,
অবিলম্বে এস সবে দরশনে তার।"

দূতগণ চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে যানে আরোহণ করিয়া প্রথমে রাণী শান্তশীলা, তার পর সত্যধীর, তার পর পুণ্যসেন,

তার পর কদম্বসেন, সর্ব্বশেষে রাজা অগ্রসেন কালিকেশের পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তখন আনন্দের স্রোত বহিল।

আমার গল্পও শেষ হইল; কেবল মাত্র একটী কথা বাকী আছে। মাধুরীর সঙ্গে যে তিনটী পরমা সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তাঁহাদের একজনকে কদম্বসেন, একজনকে পুণ্যসেন এবং একজনকে কালিকেশ বিবাহ করিয়া আপন আপন সিংহাসনের বাম পার্শ্বে বসাইলেন। রাণী শান্তশীলা মাধুরীকে কহিলেন—"মা মাধুরী, শ্রীমান্ সত্যধীর তোমার জন্যে আপনার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়াছেন; ইহাঁর ন্যায় পরম সুহৃদ আমাদের আর নাই; তুমি ইহাঁকে বিবাহ কর।" রাজা অগ্রসেনও সেই অনুরোধ করিলেন। শুনিয়া মাধুরী মাথা নামাইয়া কহিলেন—

"আমি ত পূর্ব্বেই এঁকে করেছি বরণ,
তোমাদের আজ্ঞা পেয়ে বাঁচিল জীবন।"

দুই চারি দিনের মধ্যেই সত্যধীর মাধুরীকে লইয়া মহানন্দে নিজরাজ্যে চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে—মিলনের দিনেই পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ ও সত্যধীর সকলেই মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মাধুরী, শ্বেত বলদ তোমাকে পৃষ্ঠে লইয়া সমুদ্রপথে কোথায় গিয়াছিল? এতদিন কোথায় ছিলে?" মাধুরী কেবল মাত্র উত্তর দিয়াছেন—

"আমাকে সে বৃষ-পৃষ্ঠে করিয়া স্থাপন
কোথা নিয়া গেল কিছু হয় না স্মরণ;

কি প্রকারে কতদিন জীবন কাটাই
এখন তাহার বিন্দু মাত্র মনে নাই,—”

এমন সময়ে দৈববাণী হইল—

“দেবকার্য্যে করেছিল মাধুরী প্রস্থান,
সে বিষয়ে কেহ কিছু করোনা সন্ধান।
মাধুরী, পূর্ব্বের কথা করোনা স্মরণ,
তবে দেবতার প্রিয় রবে সর্ব্বক্ষণ।”

সেই অবধি মাধুরীকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না, তিনিও কিছু মনে করিবার চেষ্টা করিতেন না। কিন্তু আমি গ্রন্থকার, একটা দৈববাণীর কথায় হার মানিবার পাত্র নহি; আমি খুঁজিয়া পাতিয়া সব জানিয়াছি—সব মনে করিয়া রাখিয়াছি। ভিতরের খবর, হে প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ, তোমাদিগকে এখন (ও) বলি নাই; পারি ত আর একদিন বলিব।

সজীব কাষ্ঠ-পুত্তলী।

অক্ষয়পুরার রাজা উশিরের পুত্র জয়সেন বালককালে কিরণ নামক সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এক ঋষির নিকট নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কিরণ ঋষি কেমন জান?

মানুষের শির অতি সুন্দর বদন,
দেহ খানি সুগঠন অশ্বের মতন।
মুখে মিষ্ট কথা কহে মানুষের প্রায়,
ক্ষুধা হ'লে মাঠে গিয়ে দুর্ব্বাদল খায়।
পাঠশিক্ষা যদি নাহি করে শিষ্যগণ
পশ্চাতের পদদ্বয়ে করে সে তাড়ন;
সন্তুষ্ট হইলে কোন শিষ্যের উপর
লেজ বুলাইয়া করে তাহাকে আদর।

ইনি পূর্ব্বে সম্পূর্ণদেহ মনুষ্যই ছিলেন। একদিন দুর্ভাগ্য বশতঃ নারদ ঋষিকে ঢেঁকিতে চড়িয়া মৃদু মৃদু যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে উপহাস করেন; বলেন—"ঠাকুর, একটা ঘোড়াও কিনতে পার না, ঢেঁকীতে চড়ে চলেছ?" ইহাতে মহামুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—"তুমি আমার শাপে অশ্বদেহ প্রাপ্ত

হও।” তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর অশ্বের ন্যায় হইতে লাগিল। স্কন্ধ পর্য্যন্ত হইয়াছে, এমন সময় কিরণ নারদের পদতলে পড়িয়া কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। তাহাতে মুনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—“যতদূর হইবার হইয়াছে; তোমার মস্তক মনুষ্যেরই থাকিবে ও তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইবে।” সেই অবধি কিরণ ঋষির এইরূপ!

এ হেন গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জয়সেন নানা বিদ্যায় অলঙ্কৃত হইলেন। যুদ্ধবিদ্যাতেই তাঁহার বিশেষ পটুতা জন্মিল। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে, তিনি গুরুর নিকট বিদায় হইয়া গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু গৃহ কোথায়? পুলক্ষ নামক এক মহা বলবান রাজা তাঁহার পিতা উশিরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনাশ করিয়াছিল এবং তাঁহার মাতা ও আত্মীয়গণকে বনবাসে পাঠাইয়া নিজে রাজ্য ও রাজপুরী অধিকার করিয়াছিল। তিনি পথে বাহির হইয়া কোথায় যাইবেন, কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, পাপাত্মা পুলক্ষকে যুদ্ধে পরাজয় ও বধ করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কটিদেশে তরবার ও পৃষ্ঠে ঢাল বান্ধিলেন এবং দুই হাতে দুই তীক্ষ্ণ বর্শা লইয়া বীরদর্পে চলিলেন। যাইতে যাইতে এক নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর স্রোতে সর্ব্বদা অতি প্রবল ঘূর্ণীপাক পড়িতেছে ও জলের গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইতেছে। জয়সেন দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কিরূপে পার হই। জলে নামিতে সাহস হইতেছে

না। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, কে যেন পশ্চাৎ হইতে কহিল—

"কিরণের প্রিয় শিষ্য রাজার কুমার,
তুমি না পিতার রাজ্য করিবে উদ্ধার?
সামান্য নদীটী দেখে এত যদি ভয়—
জলেতে নামিতে প্রাণে সাহস না হয়—
কিরূপে পুলঙ্ক সনে করিবে সমর?
ভীম মূর্ত্তি দেখি তার হইবে কাতর।"

জয়সেন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তাহার পরিধানে অপরিষ্কার জীর্ণবস্ত্র, হাতে একগাছি যষ্টি এবং পাশে একটী ময়ুর। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি গো বৃদ্ধা, বল যাইবে কোথায়,
আমার বৃত্তান্ত কেবা জানাল তোমায়?"

বৃদ্ধা কহিল—

"আমিও তোমার মত যাব নদীপার
আমাকে লইয়া চল স্কন্ধেতে তোমার।
একে নারী, তাহে বৃদ্ধা, দেহে শক্তি নাই
তোমার সাহায্যে তাই পার হ'তে চাই।
দরিদ্রা রমণী আমি, কিবা পরিচয়,
কে না তোমা' চিনে, বল, রাজার তনয়?"

শুনিয়া জয়সেন কহিলেন—"দেখ, নদীটী বড় ভয়ানক, নদীতলে অনেক পাথর আছে দেখিতেছি। স্রোতে বড় বড়

গাছ ও কত পশু ভাসিয়া যাইতেছে। এই জলে স্থিরভাবে পা ফেলিয়া আমি যে পার হইতে পারিব, এরূপ ভরসা হইতেছে না ; তাতে আবার তোমাকে কাঁধে তুলিয়া লইলে দুই জনেই মারা পড়িব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" বৃদ্ধা কহিল—

"যদি তুমি নাহি কর এই উপকার,
নিজেই যেরূপে পারি হ'ব নদী পার ;
কিন্তু যেন মনে রেখো, বলিবে সবাই—
তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান কিছুমাত্র নাই।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা জলের ধারে যাইয়া হাতের লাঠিগাছটী জলে নামাইয়া যেন জলের গভীরত্ব দেখিতে লাগিল। জয়সেন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এ বৃদ্ধাকে বিমুখ করা উচিত হয় না, লোকে নিন্দা করিবে, ধর্ম্মেও পতিত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি প্রকাশ্যে বৃদ্ধাকে কহিলেন—

"দেখ, মাতা, মনে কিছু করোনা যেমন,
কাঁধে তুলি পারে তোমা' লইব এখন।"

আরো কহিলেন—আমি মনে করিয়াছিলাম আমার কাজ যেরূপ জরুরী—আমাকে একটা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে হইবে—আপনার কাজ সেরূপ নাও হইতে পারে। সেই জন্য আপত্তি করিয়াছিলাম ; এখন আসুন।" জয়সেন হাঁটু পাতিয়া বসিলেন, বৃদ্ধাও আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার কাঁধে চাপিয়া বসিল। রাজপুত্র দুই হাতে দুই বর্শা ধরিয়া জলে নামিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—

বৃদ্ধাকে লইলা যেই স্কন্ধে আপনার
শরীরে দ্বিগুণ শক্তি হইল সঞ্চার।

ময়ূর উড়িয়া আসিয়া বৃদ্ধার মস্তকে বসিল। জয়সেন সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নদীর জলে বড় বড় বৃক্ষ তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কোনটীই তাঁহার শরীর স্পর্শ করিল না। তবে একটী বড় দুর্ঘটনা ঘটিল; তাঁহার পায়ে যে কাষ্ঠের পাদুকা ছিল, তার একখানি নদীর জলে কোথায় ভাসিয়া গেল তিনি আর খুঁজিয়া পাইলেন না। কষ্টে-সৃষ্টে নদী পার হইয়া বৃদ্ধাকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দুঃখিতচিত্তে পাদুকাশূন্য বামপদের দিকে তাকাইতেই বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল—

"তবে কি তুমিই সেই রাজার কুমার
তমাল যাঁহার কথা বলে বার বার?"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তমাল বৃক্ষ আবার কথা বলে কি প্রকারে? আর কিই বা বলে?" বৃদ্ধা কহিল—

"পুলঙ্কের নগরেতে করিলে গমন
সে সকল কথা তুমি করিবে শ্রবণ।
তোমাকে প্রসন্ন পুত্র, দেবতা নিচয়;
পিতৃরাজ্যলাভ তব হইবে নিশ্চয়।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা জয়সেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইল; তাহার ময়ূরও তাহার পাছে পাছে পেখম বিস্তার করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল।

জয়সেন একাকী চলিলেন। বহুদিন পরে তিনি সমুদ্র

তীরস্থ অক্ষয়পুরী রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজধানীতে যাইয়া দেখিলেন যে, সেখানে বহুশত লোক একত্রিত হইয়াছে, সকলেই সুন্দর পোষাক ও অলঙ্কার পরিয়াছে এবং মহানন্দ প্রকাশ করিতেছে। তিনি তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজা পুলক দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মহা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া বহুশত লোক দেশ বিদেশ হইতে তাঁহার রাজধানীতে আসিয়াছে। জয়সেন যে লোকটার সহিত কথা কহিতেছিলেন, সে বিস্মিতের ভাবে বার বার তাঁহাকে দেখিতেছিল ; কারণ তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদে অনেকটা অসাধারণত্ব ছিল। সে সহসা জয়সেনের পদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহার এক পদে পাদুকা ও অন্য পদ পাদুকাশূন্য দেখিয়া মহা বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল--

"এই গো সে বীর যুবা, দেখ সবে ভাই,
একপদে পাদুকা অপর পদে নাই।"

এই কথা বলিতেই চারিদিকে মহা কোলাহল আরম্ভ হইল। উপস্থিত লোকেরা ঠেলাঠেলি করিরা জয়সেনের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—

"এই গো সে বীর যুবা, দেখ সবে ভাই,
একপদে পাদুকা, অপর পদে নাই।"

রাজপুত্র লজ্জিত ও বিস্মিত হইয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"এই লোকগুলা কি অসভ্য! দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একখানি পাদুকা হারাইয়াছে,

তাতে কোথায় দুঃখিত হবে, না তাই লইয়া মহা কোলাহল করিতেছে; এমন অভদ্র লোক ত কোথায়ও দেখি নাই।"

গোলমাল ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। যেখানে যজ্ঞগৃহে পুলক্ষ বসিয়াছিলেন ও উপস্থিত পুরোহিতেরা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতেছিল, সেইখানে এই কোলাহল পঁহুছিল। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরা কহিল—

"এঁরি কথা কয়েছিল অক্ষয় তমাল
পুলক্ষে করিয়া দূর হবে রাজ্যপাল।"

পুলক্ষ চকিত ও ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"কে সে? যার এক পদে পাদুকা, অন্য পদ শূন্য, সেই কি? সেই এসেছে কি?" উপস্থিত সকলে কহিল—"হাঁ মহারাজ, সেই এসেছে।" তত্ক্ষণে জয়সেন পুলক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অক্ষয় তমাল নামে এক প্রাচীন দেববৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষ হইতে দৈববাণী হইত; কয়েকবার এইরূপ বাণী হইয়াছিল—

"আসিবেক বীর যুবা একাকী হেথায়,
এক পায়ে পাদুকা নাহিক অন্য পায়।
পুলক্ষে করিয়া দূর লবে রাজ্যভার;
তাঁহার যশের গানে পূরিবে সংসার।"

সেই অবধি অক্ষয়পুরীর প্রজারা এবং পুলক্ষও জানিতেন যে, সেই একপদে পাদুকাধারী আসিলেই মহা বিপদ। ঐ দৈববাণী হওয়া অবধি পুলক্ষের মনে শান্তি ছিল না। তিনি দেবতাগণকে তুষ্ট করিবার জন্য নানারূপ যাগযজ্ঞ করিতেন; বহু সংখ্যক

লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন তাহারা সকলের পাদুকার তত্বাবধারণ করিত; তাহারা কাহাকেও একপায়ে পাদুকা পরিয়া রাজার নিকটে যাইতে দিত না। রাজ্যের কাহারও পাদুকা নষ্ট হইলে সরকারী খরচে তাহাকে নূতন পাদুকা প্রস্তুত করাইয়া দিত। ঐ দিবস যজ্ঞের উৎসবে সকলেই মহা ব্যস্ত থাকায় জয়সেন যে এক পায়ে পাদুকা পরিয়া রাজধানীতে আসিয়াছেন, তাহা প্রথমে কেহ লক্ষ্য করে নাই।

রাজপুত্র জয়সেনের পাদুকাশূন্য পদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ও তাঁহার বীরোচিত মূর্ত্তি দেখিয়া পুলক্ষ প্রথমে কিঞ্চিৎ ভীতহইলেন; কিন্তু তিনি ভীরু ছিলেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের ভয় দূর করিয়া তিনি জয়সেনকে খুব রুক্ষ ভাবে কহিলেন—

"কেহে তুমি? কিবা নাম? আবাস কোথায়?
কার পুত্র? কি কারণে এসেছ হেথায়?
ভাবে বুঝি অত্যন্ত গরীব হ'বে, তাই
এক পদে পাদুকা অপর পদে নাই।"

জয়সেন গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন—

"অক্ষয়পুরীর রাজা উশিরকুমার
আমি জয়সেন; বাড়ী হেথায় (ই) আমার।
পিতাকে অন্যায় রণে করিয়া বিনাশ
তাঁর রাজ্য লয়ে এবে করিছ বিলাস।
আমি আসিয়াছি এই রাজ্যের কারণ
যার প্রাপ্য তাকে দেও, পুলক্ষ, এখন।"

পুলক্ক ধীরভাবে কহিলেন—"আচ্ছা, রাজ্যের কথা পরে হবে। আসিয়াছ তো বস; একটু বিশ্রাম কর, আর আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দাও। যদি সদুত্তর দিতে পার, তবে বুঝিব তুমি সত্য সত্যই উশিরের পুত্র, এই রাজ্যের অধিকারী। আমার প্রশ্নটী এই—মনে কর তুমি এক রাজ্যের রাজা, তোমার সেই রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য এক ব্যক্তি তোমার রাজধানীতে আসিল। সে একাকী ও নিঃসহায়, তুমি তাহাকে মারিলেও মারিতে পার, কাটিলেও কাটিতে পার: এরূপ অবস্থায় তোমার তার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?" জয়সেন বালক, তিনি বিবেচনাহীন বালকের ন্যায় উত্তর করিলেন—

"পাঠাই তাহাকে স্বর্ণলোম আনিবারে
ধরার দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রের পারে!"

বলি শুন, এই স্বর্ণলোম আনা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। একটা কথার কথা জানা ছিল—পৃথিবীর দক্ষিণ সীমায় এক দেশে স্বর্ণলোম আছে; কিন্তু সে যে কোন্ দেশ এবং কোন্ সমুদ্রের অপর তীরে কেহ তাহা জানিত না। ইহা সংগ্রহ করিতে হইলে বহুকাল সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করিতে হইবে, বহু বিপদ অতিক্রম করিতে হইবে ইহা স্থির; প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসা অত্যন্ত সন্দেহের স্থল।

জয়সেনের উত্তর শুনিয়া পুলক্ক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; মনে মনে বলিলেন—"বাছাধন এইবার নিজের কথায় নিজে ঠেকিয়াছেন। প্রকাশ্যে কহিলেন—

"ভাল, ভাল ; জয়সেন, বলেছ সুন্দর ;
তোমারি মতন এই তোমার উত্তর।
লইতে আমার রাজ্য এসেছ হেথায়,
মারিলে মারিতে পারি, তুমি নিঃসহায়।
যাও তবে ধরাপ্রান্তে সমুদ্রের পারে
ভুবনবিখ্যাত স্বর্ণলোম আনিবারে!"

রাজপুত্র ভাবিলেন—'ঠকিয়াছি, কিন্তু নরম হওয়া হ'বে না।' দম্ভসহকারে কহিলেন—

"যাইব ধরার প্রান্তে—যথায় তথায়—
আনি দিব স্বর্ণলোম, যদি পা(ও)য়া যায়।
কিন্তু বলি, হই যদি সফলমনন
প্রাণ লয়ে দেশে ফিরে করি আগমন,
তবে এ অক্ষয়পুরী, এই সিংহাসন
বিনা বাক্যব্যয়ে মোরে করিবে অর্পণ।"

পুলক ব্যঙ্গেরস্বরে কহিলেন—"দিব ; সেজন্য তোমার চিন্তা নাই ; ততদিন তোমারই জন্যে এই রাজ্য আমি সযত্নে রক্ষা করিব।"

জয়সেন পুলকের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করি। শেষে মনে করিলেন, দর্পণ নগরে যাই ; সেই নগরপ্রান্তে মহাবনে যে দেবতরু আছেন, তিনি আমাকে বলিয়া দিবেন কি করিতে হইবে। এই দেবতরু একটা প্রকাণ্ড তমালবৃক্ষ ; ইঁহার এই খ্যাতি ছিল যে, ইনি অক্ষয় ও কথা

কহিতে পারেন। ভক্তিভাবে পূজা করিয়া যদি কেহ ইহাঁকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তবে ইনি তাহার সদুত্তর প্রদান করিতেন। জয়সেন সেই মহাবনে দেবতরুর মূলে উপস্থিত হইয়া যথাবিহিতরূপে তাঁহার পূজা করিলেন এবং করযোড়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—

"কহ দেবতরু, স্বর্ণলোম আনিবারে
পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে যাই, কি প্রকারে ?"

তখন বন মধ্যে তাঁহার কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ; প্রতিধ্বনি থামিয়া গেলে চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। সহসা রাজপুত্র শুনিলেন, দেবতরুর সমস্ত পত্রগুলিতে একটু একটু শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। ক্রমে শব্দ বাড়িতে লাগিল, শেষে খুব বাড়িল ; তখন কেবল শন্‌শনানি নহে, বোধ হইল যেন তাহাতে ভাষা আছে—তাহার অর্থবোধ হয়। জয়সেন নিবিষ্ট মনে শুনিলেন, বৃক্ষ বলিতেছেন—

"রুক্ষ্ম নামে সূত্রধর, তার কাছে যাও,
পঞ্চাশ দাঁড়ের এক তরণী বানাও।"

রাজকুমারের মনে প্রথমে একটু সন্দেহ হইয়াছিল যে, তিনি সত্য সত্যই বৃক্ষের কথা শুনিলেন, না, সমস্তই তাঁর মনের কল্পনা কিন্তু তাঁহার সে সন্দেহ শীঘ্রই দূর হইল। তিনি দর্পণ নগরে যাইয়া অনুসন্ধান করিবামাত্রই জানিতে পারিলেন যে, তথায় রুক্ষ্ম নামে সত্য সত্যই একজন অতি নিপুণ সূত্রধর আছে, সে অতি সুন্দর তরি প্রস্তুত করিতে পারে। জয়সেন তাহাকে

পঞ্চাশ দাঁড়ের একখানি অতি বৃহৎ তরি প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করিবামাত্র সে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। বৎসর কালের মধ্যে উহা প্রস্তুত হইলে রাজপুত্র মনে ভাবিলেন—'এখন কি করি? তরি তো হইল, তার পর?' আর একবার দেবতরুর পরামর্শ লইবেন স্থির করিলেন। তখন আবার সেই মহাবন মধ্যে যাইয়া যথাবিহিতরূপে অক্ষয় তমালের পূজা করিয়া তিনি তাঁহাকে যুক্ত-করে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দেবতরু, বৃক্ষরাজ, শুন নিবেদন,
তরি তো প্রস্তুত, বল কি করি এখন।"

তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি থামিয়া গেলে পূর্ব্বের মত বৃক্ষপত্রের সঞ্চালন ও শন্ শন্ শব্দ হইতে লাগিল—কিন্তু সমস্ত-গুলি পত্রের নহে। একখানি খুব মোটা ডাল জয়সেনের ঠিক মাথার উপরে ছিল, তাহারি পাতাগুলি নড়িয়া শন্ শন্ করিতে লাগিল। ক্রমে কথা ফুটিলে তিনি শুনিলেন ঐ শাখা কহিতেছে—

"আমাকে ছেদন করি, রাজার নন্দন,
কাষ্ঠ পুত্তলিকা এক করাও গঠন।
তরণীর শিরোদেশে বসাইও তায়,
সমুদ্র উজ্জ্বল হবে তাহার বিভায়।"

এই কথা শুনিয়া জয়সেন মাথার উপরের ঐ ডালখানি কাটিবেন মনে করিলেন; কিন্তু কিছু ইতস্ততঃ ও করিতে লাগিলেন—দেবতরুর গায়ে হাত! পাছে কোন অনিষ্ট হয়। সহসা ঐ ডাল নড়িয়া উঠিয়া ব্যগ্রতার সহিত আবার কহিল—

"আমাকে ছেদন কর—ছেদন—ছেদন,
কোন দ্বিধা করিও না, রাজার নন্দন!"

তখন এক আঘাতে জয়সেন ডাল খানি কাটিয়া ফেলিলেন। ডালখানি কাঁধে লইয়া আবার রুক্ষের নিকট উপস্থিত; কহিলেন—"রুক্ষম,

কাষ্ঠ-পুত্তলিকা এক কর সংগঠন,
তরণীর শিরোদেশে করিব স্থাপন;
সমুদ্র উজ্জ্বল হ'বে তাহার বিভায়—
এই কথা দেবতরু বলেছে আমায়।"

শুনিয়া রুক্ষম কহিল—"আমি তো কখনো কাষ্ঠ পুত্তলিকা গড়ি নাই, তবু দেখা যাক্।" 'দেখা যাক্' বলিয়া সে হাতুড়ি বাঁটাল লইয়া পুতুল গড়িতে বসিল, আর তাহার হাত আপনা আপনি চলিতে লাগিল।—

বাঁটাল আপনি চলে—কে যেন চালায়,
নাক, মুখ, চোক, কাণ হয়ে হয়ে যায়;
হইল সুন্দর বাহু, সুন্দর চরণ,
মোহিনী রমণীমূর্ত্তি হইল গঠন।
বিস্মিত সে সূত্রধর, কহে—"যুবরাজ,
একি দেবীমূর্ত্তি আমি গড়াইনু আজ!"

তখন রাজপুত্র ঐ রমণীমূর্ত্তি সসম্ভ্রমে তাঁহার তরির শিরোদেশে স্থাপন করিলেন; পরে অর্দ্ধস্পষ্টস্বরে আপনি কহিলেন—"আবার দেবতরুর নিকটে যাই, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করি, এখন কি করিতে হইবে।" এই কথা বলিবামাত্র কে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে মৃদু শন্ শন্ স্বরে কহিল—

দেববৃক্ষে জিজ্ঞাসিতে নাহি প্রয়োজন,
যাহা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞাস, বাছাধন।"

জয়সেন বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, কাষ্ঠপুত্তলিকার ওষ্ঠ যেন নড়িতেছে, কথা কহিতে মুখের যেরূপ ভঙ্গি হয়, তাহার মুখের যেন সেইরূপ ভঙ্গি হইতেছে। তিনি ভাবিলেন—হবে না কেন ? এ পুত্তলি তো দেবতরুরই শাখায় নির্ম্মিত, এ কথা কহিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? বরং ইহার কথা না কহাই আশ্চর্য্য। যাহোক্ হ'ল ভাল ; এখন আর কষ্ট করিয়া দেবতরুর নিকটে যাইতে হইবে না ; এই পুত্তলিকাই আমাকে যখন যে পরামর্শ দিতে হয় দিবে। এই ভাবিয়া তিনি পুত্তলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহ, পুত্তলিকে, আমি পাইব কোথায়
পঞ্চাশৎ রণ বীর আমায় সভায় ;
পঞ্চাশৎ দাঁড় এই তরিতে আমার
আমি একা ; ব'লে দেও কোথা পাই আর।"

পুত্তলিকা কহিল—

সমস্ত ভারতে কর বারতা জ্ঞাপন,
মহাবীরগণে এই দেহ নিমন্ত্রণ—
'যুবরাজ জয়সেন, উশির নন্দন,
করিবেন স্বর্ণলোমসন্ধানে গমন ;

পঞ্চাশৎ রণ বীরে প্রয়োজন তাঁর
জলে স্থলে তাঁর সহ করিবে বিহার;
সুখে দুঃখে সদা তাঁর হইবে সহায়,
হইবে তাঁহার যশে যশস্বী ধরায়!"

জয়সেন তাহাই করিলেন। অল্পদিন মধ্যে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে পঞ্চাশ জন মহাবীর আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই অসুররাক্ষসাদি বধ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।—

আসিলেন বজ্রবাহু, যিনি একবার
মস্তকেতে বহিলেন আকাশের ভার!
কস্তূর, পলাক্ষবীর, ভ্রাতা দুই জন,
ডিম্ব মধ্যে হয়েছিল যাঁদের জনন।
খর আসিলেন, যাঁর নয়ন যুগল
ভূমি ভেদি, জল ভেদি দেখিত সকল।
অরবিন্দ, সুললিত বীণাবাদ্যে যাঁর
নাচিত বনের পশু, বিহঙ্গ শাখার;
নির্জীব যে বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, পাষাণ
তারাও নাচিত শুনি যাঁর বীণাগান।
বীরাঙ্গনা তরলিকা, বীরত্বে অপার,
হরিণীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল তাঁর;
এত লঘু গতি তাঁর যুগল চরণ,
তরঙ্গের শিরে শিরে করিত ভ্রমণ;

লম্ফ দিয়া বায়ুপৃষ্ঠে উঠি বার বার
বায়ুবেগে সর্ব্বস্থানে করিত বিহার।
ত্রিপার্শ্ব আসিল, যিনি জ্যোতিষে পণ্ডিত,
গণি ভবিষ্যত্ কথা করিতা বিহিত।

এঁরা সকলে আসিলেন; আরো কত তেজস্বী, উৎসাহশীল বীরগণ আসিলেন আমি কত নাম করিব? সকলেই আসিয়া জয়সেনকে কহিলেন—

"রাজপুত্র, সবে মোরা তোমার স্বগণ,
যেথায় যে কার্য্যে ইচ্ছা কর নিয়োজন;
জলেস্থলে তব কার্য্য করিব উদ্ধার
যমপুরীতেও সঙ্গে যাইব তোমার।"

তখন জয়সেন জোতিষে পণ্ডিত ত্রিপার্শ্বকে তাঁহার তরির কর্ণধারণে নিযুক্ত করিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরকে তরির অগ্রভাগে বসাইলেন; তিনি সমুদ্রের তলে কোথায় পাহাড়, কোথায় চড়া ইত্যাদি আছে বলিয়া দিয়া কাণ্ডারীকে সাবধান করিবেন। অরবিন্দের হাতে বীণা দিয়া তাঁহাকে কহিলেন—

"করিও সঙ্গীতরাজ, গীতআলাপন,
অক্লান্তে করিব মোরা তরণিচালন।"

এইরূপে যে যাঁর কাজে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তরিতো তখনো শুকনয়; তখনো জলে নামান হয় নাই। পঞ্চাশজন মহাবীর সজোরে উহাকে ঠেলিতে লাগিলেন, তবু উহা এক

পদও নড়ে না। জয়সেন অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া করযোড়ে পুত্তলিকার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—

"কহ, পুত্তলিকে, এবে কি করি উপায় ?
সাগরে তো তরি দেখি ভাসান না যায়।"

পুত্তলিকা কহিলেন—

দাঁড়ধরি যথাস্থানে বসো, বীরগণ,
অরবিন্দ করিবেন গীত আলাপন।
আপনি নড়িবে তরি—ভাসিবে সত্বর ;
লহ উপদেশ মম, রাজার কোঙর।"

জয়সেন সহচরগণকে সেইরূপ অনুরোধ করিলেন। তখন আশ্চর্য্যের কথা শুন, যেই অরবিন্দ বীণা স্পর্শ করিলেন, তারগুলি ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, অমনি সেই প্রকাণ্ড তরি শিহরিয়া উঠিল ; তার পর একটা গান আরম্ভ হওয়া মাত্র তরি চলিতে লাগিল—গানের আধখানা হইতে না হইতেই সাগরের জলে ভাসিতে লাগিল। বীরগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন—তীরস্থ দর্শকেরাও জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অরবিন্দ বীণা বাজাইতে লাগিলেন, তরি পবনবেগে চলিতে লাগিল। যাঁহারা দাঁড় ধরিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহাদের দাঁড় ধরা মাত্রই কাজ, বাহিতে আর হইল না। এই-রূপে বহুদিন চলিল।

যে স্বর্ণলোমের অন্বেষণে জয়সেন চলিয়াছেন, যাহার এত খ্যাতি তাহার কাহিনী বলি, শুন। পূর্ব্বকালে বেশমনা নামে এক রাজ্য ছিল ; তথাকার রাজা দুইটী শিশুপুত্র রাখিয়া মরিয়া

যান। রাণী ধাত্রী অনুরক্তার হস্তে ঐ দুই শিশুর লালনপালনের ভার অর্পণ করিয়া পতির সহিত চিতারোহণ করেন। মৃত রাজার ছোট ভাই কুলক্ষণ ভ্রাতৃশিশুদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা করে। ঐ রাজপুত্র দুইটীর একটী অতি প্রিয় মেষী ছিল, তাহার দুইটী শাবক ছিল। রাজপুত্রেরা সর্ব্বদা ঐ মেষী ও শাবক দুইটীর সহিত খেলা করিত এবং তাহাদিগকে লইয়া এক ঘরে শুইত। কুলক্ষণ ভ্রাতৃপুত্রগণকে মারিবার জন্য বিমুখনামে যে লোককে নিযুক্ত করে, সৌভাগ্যক্রমে সে অনুরক্তাকে ভালবাসিত এবং তাহার অনুনয় বিনয়ে বশীভূত হয়। কুলক্ষণ বিমুখকে বলে—"তুমি আজই রাত্রে ঐ বালক দুইটীকে বধ করিয়া এক ঘটি রক্ত আমাকে আনিয়া দিবে; আমি তাহা দ্বারা আমার পা ধুইব।" এই কথা সে যাইয়া অনুরক্তাকে বলে। শুনিয়া অনুরক্তা কান্দিতে লাগিল। তখন ঐ মেষী যেন সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়াই তাহার শাবক দুইটীকে বিমুখের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল এবং আপনিও তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল; যেন স্পষ্টই বলিল—

"আমাদিগের হত্যা করি রক্ত নিয়ে যাও,
প্রিয় রাজশিশুদের জীবন বাঁচাও।"

বিমুখ অনুরক্তার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, ঐ মেষগুলিকে কাটিয়া তাহাদের রক্ত কুলক্ষণকে দিবে এবং অনুরক্তা রাত্রি মধ্যেই শিশুদিগকে লইয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। বিমুখ একটী মেষশাবকে কাটিতে উদ্যত হইলে

বৃদ্ধা মেষী আপনার গলা বাড়াইয়া দিল। সে তখন তাহাকেই আগে কাটিল, পরে শাবকদুটীকে কাটিল; তাহারা সকলেই যেন মহানন্দে প্রাণত্যাগ করিল। অনুরক্তা সেই দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুলক্ষণ সেই ক্রন্দন শুনিয়া মহাসুখে মনে মনে ভাবিল, এইবার কার্য্য শেষ হইয়াছে, আপদ গেল। বিমুখ তাহাকে এক ঘটি রক্ত আনিয়া দিল, সে তাহা দ্বারা পা ধুইয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে ঘরে যাইয়া শুইল।

এদিকে ধাত্রীর ক্রন্দনে রাজশিশুরা জাগরিত হইল। ধাত্রী তাহাদিগকে সব কথা বুঝাইয়া কহিল—

"পাপরাজ্য ছেড়ে যাই চল, বাছাগণ,
এখানে থাকিলে আর রবে না জীবন।"

রাজবালকেরা সম্মত হইল। কিন্তু অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিল—

"প্রাণ দিয়ে বাঁচাইল আমাদের প্রাণ
এই মেষী আর তার দুইটী সন্তান।
ইহাদের চর্ম্মগুলি এস নিয়ে যাই,
উষ্ণীষ করিয়া শিরে পরিব সদাই।
পরহিতে প্রাণ যারা করিল প্রদান
রাজশির তাহাদের উপযুক্ত স্থান।"

তখন তাহারা সত্বরে মৃতপশু তিনটীর চর্ম্ম খুলিয়া লইল এবং রাজপুরী হইতে পলায়ন করিল। পরদিন প্রভাতে পেটিকা খুলিয়া ঐ চর্ম্মগুলি বাহির করিয়া দেখে—

যতগুলি লোম ছিল চর্ম্মের উপর
সোণার পশম হ'য়ে রয়েছে সুন্দর,
প্রভাতসূর্য্যের করে ধিক ধিক জ্বলে ;
এমন জ্যোতির স্বর্ণ নাহি ধরাতলে ।

এই যে স্বর্ণলোম, যুবরাজ জয়সেন ইহারই সন্ধানে যাইতেছেন। রাজবালকগণ যেখানা রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া দূরদেশে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ স্বর্ণ লোমাবৃত মেষচর্ম্ম তাহাদের রাজধানীর পুষ্পোদ্যানে একটা বৃক্ষ-শাখায় অতি যত্নে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন ; তাহার জ্যোতিতে সমস্ত রাজধানী আলোকিত হইত। এইসব কথা লোকমুখে শুনা যাইত ; কিন্তু সেই রাজ্য ও রাজধানী যে পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে তাহা কেহ কহিতে পারিত না। সেই জন্য জয়সেন ও তাঁহার সহচরগণ অন্ধের মত অনিশ্চিতভাবে যাইতেছিলেন।

যাই হউক, বীরেরা বেশ সুখে যাইতেছেন। নৌকা বড় বাহিতে হয় না, অরবিন্দের বীণাধ্বনিতে সে আপনা আপনিই চলে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি খর আছেন, তিনি জলের নীচে কোথায় পাহাড় কোথায় চড়া পূর্ব্বেই বলিয়া দেন, কাণ্ডারী ত্রিপার্শ্ব তাই বুঝিয়া সাবধানে হাল ধরেন। পুত্তলিকাত আছেনই, তিনি বিপদে আপদে সৎপরামর্শ দেন।

এইরূপে নৌকা বহুকাল চলিল। অবশেষে তাঁহারা লবণ দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। দ্বীপের রাজা শীর্ষ, জয়সেন ও তাঁহার সহচরগণকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন

এবং সেখানে তাঁহাদিগকে মহা সমারোহে পানাহার করাইলেন। জয়সেন দেখিলেন—রাজা শীর্ষের মুখখানি অতি মলিন, যেন তাঁহার মনে বড় দুঃখ ; জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন, নৃপবর, মুখ মলিন তোমার,
পারি কি করিতে তব কোন উপকার ?"

শীর্ষ কহিলেন—"এই রাজধানীর উত্তরে ঐ আকাশপ্রান্তে যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, উহার চূড়া সকলের উপরে আপনারা কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি ?" জয়সেন কহিলেন—"আমার বোধ হয় মেঘ, কাল কাল মেঘ, কতকটা মানুষের মত আকৃতি।" তীক্ষ্ণদৃষ্টি খর কহিলেন—"আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি. ও সব মেঘ নহে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্য সকল দাঁড়াইয়া আছে, প্রত্যেকের ছয়টী করিয়া হাত, এক এক হাতে এক এক অস্ত্র। ওরা যে মুখভঙ্গি ও ভ্রূকুটি করিতেছে, আমি তাহাও দেখিতে পাইতেছি।" শুনিয়া শীর্ষ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিতের স্বরে কহিলেন—

রাজ্য নাশ করিতেছে এই দৈত্যগণ,
কত প্রজা বিনাশিল নাহিক গণন।
দৈত্যের সহিত রণ বিষম ব্যাপার,
কেমনে করিব রাজ্য, জীবন উদ্ধার ?"

জয়সেন ও তাঁহার সহচর বীরগণ সদর্পে কহিলেন—

"নাহি ভয়, নৃপবর, আমরা সকলে
দৈত্যগণ সহ রণ করিব সবলে।"

ইহার কিছুকাল পরে দৈত্যেরা রাজধানীতে আসিয়া পড়িল। ভারতের বীরগণ তাহাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অনেককে বিনাশ করিলেন, বাকীগুলি লবণ দ্বীপ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

এইরূপে রাজা শীর্ষের মহা উপকার করিয়া বীরগণ আবার নৌকায় চড়িয়া চলিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা সমুদ্রতীরস্থ ত্রিপত্র নগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগরের রাজা পাংশু অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। ভারতের বীরগণ আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া কহিলেন—

"অনাহারে মৃতপ্রায় হয়েছি এখন,
রক্ষা কর, বীরগণ পাংশুর জীবন।
ভীষণা রাক্ষসী এক, পক্ষশীলা নাম,
অলক্ষ্যে এ রাজপুরে রহে অবিরাম।
নারীর বদন তার গৃধিণীর কায়,
তাহার নখরাঘাতে প্রাণ বাহিরায়।
আমার আহার্য্য আর পানীয় লইয়া,
আমার আহারকালে যায় পলাইয়া।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বসি করিতে ভোজন,
পান পাত্র হাতে লই তৃষ্ণার্ত্ত যখন,
চক্ষের নিমেষে আসি কোথা হ'তে পড়ে
কাড়িয়া মুখের গ্রাস ধায় উভরড়ে

লৌহের কপাট কিম্বা প্রস্তর দেবাল
ভেদ করি গতিবিধি করে সর্ব্বকাল।
অতি গোপনীয় স্থানে করে সে প্রবেশ ;
কতই কৌশল জানে, মোহিনী অশেষ
কভু ভৃত্যরূপে আসি দাঁড়াইয়া রয়
কভু মোর রাণী সাজে, তনয়া, তনয় ;
আদর করিয়া কহে—"খাও, মহারাজ,
দুরন্ত রাক্ষসী আর আসিবে না আজ।"
আশ্বাসিত হ'য়ে যাই খাইতে যেমন
অমনি সে খাদ্য ল'য়ে করে পলায়ন।
আমরি মূর্ত্তিতে কভু পাকশালে যায়
যা'কিছু আমার খাদ্য লইয়া পলায়।
এই রাক্ষসীরে যদি না কর সংহার,
বীরগণ, প্রাণ আর রহে না আমার।"

তখন, বীরাঙ্গনা তরলিকা বলিলেন—"আমি এই রাক্ষসীকে বধ করিব ; মহারাজ, আপনার ভয় নাই।" সকলে পরামর্শ করিয়া আহারের আয়োজন করিলেন ; খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সকল উপস্থিত করা হইলে উলঙ্গ তরবারি হস্তে তরলিকা পাংশুর পার্শ্বদেশে দাঁড়াইলেন। যেই রাজা খাদ্যদ্রব্য মুখে তুলিবেন, অমনি রাক্ষসী শূন্যপথে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে খাদ্য কাড়িয়া লইয়া আকাসে উড়িল। তরলিকাও তরবারি দ্বারা তাহাকে ভীষণ আঘাত করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িলেন।

আকাশে ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু অতি অল্পক্ষণ। ক্ষণকাল রক্তবৃষ্টি হইল, তার পর রাক্ষসীর ছিন্ন অঙ্গ সকল ভূমিতে পতিত হইল; তরলিকাও নামিয়া আসিলেন। পাংশুর ও তাঁহার প্রজাগণের আর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। তাঁহারা তরলিকাকে শত মুখে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে পক্ষশীলা রাক্ষসী বধ হইল।

তার পর বীরগণ আবার সমুদ্র বাহিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তীরে নূতন দুর্ব্বাক্ষেত্র শ্যামল গালিচার মত বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিয়া বীরগণ নৌকা হইতে নামিয়া ঐ দুর্ব্বাক্ষেত্রে কেহ শুইলেন, কেহ বা বসিয়া আরাম করিতে লাগিলেন। সহসা—

আকাশ হইতে হয় পালক বর্ষণ
ফুটিতে লাগিল দেহে তীরের মতন।

সকলে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখেন একদল অতি বৃহৎ পক্ষী উর্দ্ধদেশ হইতে ঐরূপ পালকবর্ষণ করিতেছে। তাঁহারা উঠিয়া দৌড়িতে লাগিলেন, পক্ষিগণও সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাইতে যাইতে অবিশ্রান্ত পালক ছুড়িতে লাগিল। পরিত্রাণ নাই। অবশেষে জয়সেন পুত্তলিকার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহ, পুত্তলিকে, এবে কি উপায় করি,
পালক আঘাতে বুঝি সবে প্রাণে মরি।"

পুত্তলিকা কহিলেন—

"চর্ম্মে চর্ম্মে, অসি চর্ম্মে করে ঠনাঠন্,
মহা কোলাহল কর—দেখিবে এখন।"

বীরেরা তাহাই করিলেন। পক্ষী সকল বিকট কোলাহলে ও কর্কশ ঠন্ঠনা শব্দে ভীত হইয়া সত্বরে সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া গেল। অরবিন্দ তখন মহানন্দে বীণা বাজাইতে লাগিলেন। জয়সেন বাধা দিয়া কহিলেন—"বাপরে, কর কি, কর কি?—

পাষাণ মোহিত হয় তোমার সঙ্গীতে
পাখীরা শুনিলে ফিরে আসিবে শুনিতে;

অতএব বাজাইও না, ক্ষণেক অপেক্ষা কর।"

কিছুকাল পরে তাঁহারা দেখিলেন, সমুদ্রপথে আর একখানি তার আসিতেছে। উহা তীরে আসিলে উহা হইতে দুইটী অতি সুন্দর রাজপুত্র নামিয়া আসিলেন। জয়সেন তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া পরিচয় ও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন—

"স্বর্ণলোমরাজপুত্র আমরা দু'জন
সম্প্রতি ভারতবর্ষে করিব গমন।'

"স্বর্ণলোম রাজপুত্র কি? স্বর্ণলোম কি কোনও রাজ্যের নাম?" জয়সেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নবাগতেরা কহিলেন—"আমাদের পিতা স্বর্ণলোমাবৃত মেষচর্ম্ম লইয়া আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্য রাজ্যের নামও স্বর্ণলোম রাখিয়াছেন। জয়সেন তখন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে

স্বর্ণলোমবিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন।" জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র কহিলেন—

"রাজকীয় পুষ্পোদ্যানে অশোকের শাখে
স্বর্ণলোমাবৃত চর্ম্ম বিরাজিত থাকে।
সে উদ্যানে যত ফুল প্রস্ফুটিত হয়
তাহার আভায় সব হয় স্বর্ণময়।
সে চর্ম্ম বেড়িয়া হেম কুসুম সকল
শোভে যেন শশাঙ্কে বেষ্টিয়া তারাদল।"

জয়সেন কহিলেন—"আমি কি সেই স্বর্ণলোমের কিছু পাই না? আমরা এই স্বর্ণলোমের আশায় বহুকষ্টে এতদূর আসিয়াছি।" রাজপুত্র কহিলেন—

"ভীম অজাগর এক প্রহরী উদ্যানে,
দেব, দৈত্য, নর কেহ যায় না সেখানে।
সে রাজ্যের পতি যেই কেবল তাঁহার
উদ্যানেতে প্রবেশিতে আছে অধিকার।
যদি তার ত্রিসীমায় কর পদার্পণ,
এক (ই) গ্রাসে তোমাদিগে করিবে ভক্ষণ।
অমূল্য জীবন কেন বৃথায় হারাও,
যেথা হ'তে আসিয়াছ সেথা ফিরে যাও।
স্বর্ণলোম-লাভে আরো কত অন্তরায়,
কি আর কহিব, বীর, সে সব তোমায়?"

জয়সেন কহিলেন—"ভাল, আমি এত সহজে ভয় পাইবার

হইলে এতদূর আসিতাম না, একার্য্যে হস্তক্ষেপও করিতাম না। আমার প্রাণের মমতা কিছু কম।" পরে আপনার সহচরগণের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

"ভারতের বীরগণ, যদি ভয় পাও,
যার যার ইচ্ছা হয় গৃহে ফিরে যাও।
আমার সঙ্কল্প স্বর্ণলোম আহরণ,
না হয় নাগের রণে হারাব জীবন।"

সহচরগণ একবাক্যে কহিলেন—

"তিল মাত্র সঙ্গ ছাড়া হ'ব না তোমার
যত দিন কার্য্য তব না হয় উদ্ধার।
নাগাসুর, রক্ষ, দৈত্যে ভয় বড় নাই,
দু'চারিটী আমরাও মারিয়াছি, ভাই।"

তাহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া নৌকায় উঠিলেন। স্বর্ণলোমের রাজপুত্রেরা পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে যাওয়ার অভিপ্রায় সম্প্রতি পরিত্যাগ করিয়া রঙ্গ দেখিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

কিছুদিন পরে সকলে স্বর্ণলোম রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজ্যের রাজা হিতেশ তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে রাজধানীতে আনায়ন করিলেন। তিনি জয়সেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি, যুবক, কহ কাহার নন্দন,
কোথা হ'তে কি কারণে হেথা আগমন।"

জয়সেন রাজাকে অবনত শিরে অভিবাদন করিয়া কহিলেন—

"অক্ষয়পুরীর রাজা উশির তনয়
অমি জয়সেন, শুন, নৃপ মহাশয়।
পুলক্ষ নামেতে এক দুরন্ত দুর্জ্জন
পিতৃ সিংহাসনে মোরে করেছে বঞ্চন।
এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমার সমীপে
আমাকে সে নির্ব্বিবাদে রাজ্য ছেড়ে দিবে
ধনে কিম্বা চেয়ে পাই—যে কোন প্রকারে
যদি কিছু স্বর্ণলোম নিয়ে দেই তারে।
এই অভিপ্রায়ে, নৃপ, এসেছি হেথায়,
কিছু স্বর্ণলোম আজ্ঞা করুন আমায়।"

যখন জয়সেন কথা কহিতেছিলেন, তখন হিতেশ রাগে ফুলিতেছেন; মনে মনে কহিতেছিলেন—"বালকটার আস্পর্দ্ধা দেখ, যে স্বর্ণলোম দেবদৈত্যের অপ্রাপ্য, যাহা আমার রাজ্যের ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাতা, আমি তাহা উহাকে চাহিতেই দিব কিম্বা উহার নিকট বিক্রয় করিব।" কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"রাজপুত্র স্বর্ণলোম চাহিলেই পাওয়া যায় না, বিক্রয়ও হয় না;

স্বর্ণলোমলাভ-করা বাসনা যাহার
বীরত্বপ্রকাশ কিছু প্রয়োজন তার।
দুই মহা বৃষ আছে লৌহের চরণ,
লৌহেতে নির্ম্মিত শৃঙ্গ অতীব ভীষণ,

উদরেতে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে বার মাস,
অগ্নির তরঙ্গ ছোটে ফেলিতে নিশ্বাস—
এমনই প্রখর অগ্নি, এক শিখা তার
মুহূর্ত্তে জীবের দেহ করে ছারখার।
এই বৃষদ্বয়ে রণে করিবে বিজয়
কাল নিশি পোহাইলে, রাজার তনয়।"

জয়সেন শুনিয়া ভীত হইলেন না। জিজ্ঞাসিলেন—"তার পর?"

"লাঙ্গলে সে বৃষদ্বয়ে করিয়া বন্ধন
সমর স্থলের ভূমি করিবে কর্ষণ।"

রাজা হিতেশ এক এক কথা বলিতেছেন, আর দেখিতেছেন, জয়সেন ভীত হন কিনা; জয়সেন তাহা বুঝিয়া ভয়ের লেশমাত্রও দেখান না। জিজ্ঞাসিলেন—"তার পর?"

"বীরদন্ত নাগের দশন চারি পাঁচ
রোপিবে কর্ষিত ভূমে শুন, যুবরাজ।
সেই সব দন্ত হ'তে জন্মিবে তখন
অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত মহাবীরগণ;
বড় ক্রোধ-পরায়ণ, কলহকুশল
দন্ত হ'তে আবির্ভূত এ যোদ্ধা সকল।
তুমি ও তোমার এই সহচরগণ
পারিবে কি তাহাদিগে করিতে দমন?"

জয়সেন উত্তরে কহিলেন—"দেখা যাবে; কিন্তু যদি আমি

আপনার বৃষ দু'টীকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দ্বারা ভূমি কর্ষিয়া লইতে পারি এবং বীরদন্ত নাগের দাঁত রোপিয়া বীরগণ উৎপন্ন করি ও তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারি, তবে আমাকে স্বর্ণলোম দিবেন কি ?" রাজা হিতেশ কহিলেন—"সে কথা পরে হবে। উহা যে উদ্যানে আছে, তাহার প্রহরীর হস্তে নষ্ট হইবার অধিকার পাইতে হইলেও এই সকল বীরকার্য্য প্রথমে করিতে হয়।"

যতক্ষণ জয়সেন রাজার সহিত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া একটি অত্যন্ত রূপসী যুবতী তাঁহাকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। জয়সেন রাজার নিকট হইতে বিদায় হইয়া দরবার গৃহের বাহিরে আসিলে ঐ যুবতী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কহিলেন—"যুবরাজ আমি রাজপুত্রী, মন্দা।" শুনিয়া তিনি তাঁহাকে শির নোঁয়াইয়া অভিবাদন করিলেন। মন্দা অতি সুন্দরী এ কথা বলিয়াছি; কিন্তু এ কথা বলা হয় নাই যে, তাঁহার চোখ মুখের ভাবে তাঁহাকে অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমতী বলিয়া বুঝা যাইত। তিনি মৃদু মধুর হাসিতেন; সে হাসির আভায় তাঁর সুন্দর মুখ আরো সুন্দর হইত। তিনি কহিলেন—

"সত্যই বৃষের সনে করিবে কি রণ ?
সত্যই কি নাগদন্ত করিবে রোপণ ?
উদ্যানের প্রহরীকে করি পরাজয়,
যুবরাজ, স্বর্ণ-লোম নিবেই নিশ্চয় ?"

জয়সেন পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন—প্রাণ যায় তাও স্বীকার তবু চেষ্টা করিব। রাজকুমারীর মৃদু হাস্যজড়িত কথায় কিছু ব্যঙ্গের ভাব ছিল, তাহাতে তাঁহার গর্ব্ব উথলিয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—

"লইব; এই বৃষদ্বয়ে করিব বিজয়,
রোপিব কর্ষিয়া ভূমি নাগদন্তচয়;
উদ্যানপালক নাগে বশীভূত করি
স্বর্ণ-লোম লইবই, রাজার কুমারি,
এতে যদি প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার—
সঙ্কল্প সাধনকল্পে প্রাণ কোন্ ছার?"

শুনিয়া মন্দা মনে মনে বড় হর্ষান্বিতা হইলেন; কহিলেন—

'আমার সাহায্য যদি লহ যুবরাজ,
জীবন (ও) যাবে না, তুমি উদ্ধারিবে কাজ।"

জয়সেন জিজ্ঞাসিলেন—"কিরূপে? মন্দা, তুমি স্ত্রীলোক, তুমি কি সাহায্য করিবে?" মন্দা মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন—

"এ কি কথা? রাজপুত্র, এতই অসার,
নারী কি এতই তুচ্ছ বিচারে তোমার?"

জয়সেন মন্দার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর দিকে দৃষ্টি করিয়া কিছু লজ্জিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, এই রমণীর সহায়তা তুচ্ছ করিবার সামগ্রী নহে। প্রকাশ্যে কহিলেন—

প্রভাবতি, দয়া যদি করিবে আমায়,
কেমনে, কোথায়, কহ, হইবে সহায়?"

মন্দা তাঁহার হস্তে একটি স্বর্ণ কৌটা দিয়া কহিলেন—"এই কোটাতে যে তৈল আছে, উহা তোমার সমস্ত শরীরে ভাল করিয়া মাখিয়া যুদ্ধে যাইও, তাহা হইলে বৃষদ্বয়ের অগ্নিময় নিশ্বাসে তোমার শরীর পুড়িবে না। দু'প্রহর রাত্রিতে এই স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে ; আমি তোমাকে বৃষদ্বয়ের নিকট লইয়া যাইব।" এই বলিয়া মন্দা অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দু'প্রহর রাত্রিতে জয়সেন নির্দ্দিষ্টস্থানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। মন্দা অন্তঃপুর হইতে আসিলেন এবং তাঁহার শরীরে আপন হস্তে তৈল মাখিয়া দিলেন। তারপর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যেখানে লৌহের বেড়ার বেষ্টিত ভূমিখণ্ডে বৃষদ্বয় শুইয়াছিল সেই দিকে চলিলেন। বৃষদ্বয়ের অগ্নিময় নিশ্বাসে চতুর্দ্দিকের বায়ু গরম হইয়াছিল. জয়সেন যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই ইহা বুঝিতে লাগিলেন। তিনি দূর হইতে দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ বৃষাসুরদ্বয় শয়ন করিয়া আছে আর তাহাদের নাসারন্ধ্র হইতে—

ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিশিখা হতেছে ক্ষরণ,
চমকে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ যেমন ;
সে আলোকে পশুদের দেহ দেখা যায়
আগ্নেয় পর্ব্বত সম পড়িয়া ধরায়।
অর্দ্ধ নিমীলিত আখি, রোমন্থনে রত,
কণ্ঠেতে ঘর্ঘর শব্দ হ'তেছে নিয়ত।

রাজপুত্র মন্দাকে পশ্চাতে রাখিয়া আর একটু অগ্রবর্ত্তী হইলে তাঁহার পদশব্দ বুঝি বৃষদ্বয়ের কর্ণে পঁহুছিল; কেননা, তাহারা সহসা রোমন্থন পরিত্যাগ করিয়া কর্ণ প্রসারিত করিল ও চক্ষু মেলিল; রাজপুত্র চন্দ্রালোকে এই সকল দেখিলেন, দেখিয়া সাবধানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃষদ্বয় তাঁহাকে দেখিল। আর যাবে কোথায়? অমনি

ভীমনাদে চতুর্দ্দিক্ করি মুখরিত
এক লম্ফে বৃষদ্বয় উঠে আচম্বিত।
উদর মধ্যের অগ্নি ধক্ ধক্ জ্বলে
নাসারন্ধ্র হ'তে শিখা ছুটিছে সবলে।
সে অনলে প্রকাশিত হয় চারিধার,
ভস্ম হলো বৃক্ষলতা প্রতাপে তাহার;
লৌহময় শৃঙ্গগুলি, লৌহের চরণ
ঠনাঠন্ শব্দ করে, বধির শ্রবণ;
জ্বলন্ত তাম্রের মত উদ্দীপ্ত নয়নে
শির নোঁয়াইয়া বেগে আসে আক্রমণে।

জয়সেন স্থির হইয়া একপদ সম্মুখে ও একপদ পশ্চাতে স্থাপন করিলেন ও দুই হাত প্রসারিত করিয়া আক্রমণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃষদ্বয়ের নিশ্বাসের অগ্নি তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারিল না। তাহারা তাঁহার শরীরের উপর ঝাঁপিয়া পড়ে পড়ে এমন সময়ে মন্দা পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

"ওরে বৃষ, বলি আগে
হরের দোহাই লাগে।
নন্দীভৃঙ্গী মহাকাল,
বম্ বম্ বাজে গাল।
হ্রীং ক্লীং হুম্ হঃ
ঠিক্ হয়ে খাড়া রঃ!"

মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রেই যেন মুগ্ধ হইয়া বৃষদ্বয় স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদের উদরের অগ্নি নিভিয়া গেল, নাক দিয়া আর শিখা বাহির হইতে লাগিল না। তখন জয়য়েন দুই হাতে তাহাদের শিং ধরিয়া ফেলিলেন, তাহারাও মেষশাবকের মত বিনীতভাবে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। মন্দা কহিলেন—

"লাঙ্গলেতে বৃষদ্বয়ে করহ বন্ধন,
শীঘ্র করি কর এই মৃত্তিকা কর্ষণ।"

রাজপুত্র তাহাই করিলেন। তখন মন্দা বস্ত্রাঞ্চলের মধ্য হইতে একটি ঝাঁপি বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে তাঁহার হস্তে বীরদন্ত নাগের কতকগুলি দন্ত দিয়া কহিলেন—"এইগুলি বপন কর।" দাঁতগুলি রোপণ করা হইলে তাঁহারা ক্ষেত্রের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বীরদন্তনাগের দাঁত মাটিতে পুতিলে কি শস্য ফলে, তাহা তোমরা জান। এ ক্ষেত্রেও সেই শস্য ফলিল। শিরে লৌহের শিরস্ত্রাণ, সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আচ্ছাদিত, হাতে শাণিত তরবার, রুদ্রমূর্ত্তি বীরগণ ক্ষণকাল মধ্যে ভূমি ভেদ করিয়া উঠিয়া সিংহনাদ ও মহা আস্ফালন করিতে লাগিল। তাহারা জয়-

মন্দা ও জয়সেন।

কৌতুক-কাহিনী—২০৮ পৃষ্ঠা।

সেনকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাকেই শত্রু মনে করিয়া, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেহ বলে 'মার!' কেহ বলে 'কাট!' এই ব্যাপার। জয়সেন তাঁহার অসি নিষ্কোষিত করিলেন। তাহা দেখিয়া মন্দা কহিলেন—"তুমি ক্ষেপেছ নাকি? একা এতগুলি অসুর অবতারের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে? আমার পরামর্শ শুন, ওদের মাঝখানে এই পাথরখানি ছুড়ে মার, দেখবে এখন।", এমন স্থলে পাথর ছুড়িয়া মারিয়া কালিকেশ যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু জয়সেন তাহা জানিতেন না; তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া মন্দার কথামত কার্য্য করিলেন। পাথরখানি ভূমিজাত এক বীরের মাথায় লাগিয়া পশ্চাতের এক জনের বাহুতে ও তাহার পার্শ্বের এক জনের উরুতে লাগিল। প্রথম জন মনে করিল তাহার পশ্চাতের লোকটি তাহাকে মারিয়াছে, সে আবার মনে করিল, তাহার পাশের লোকটি তাহাকে আঘাত করিয়াছে। তখন তিন জনে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল; তাহা দেখিয়া আর আর সকলে কেহ এ পক্ষ কেহ সে পক্ষ অবলম্বন করিয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল। শুনহে, আমার সরলমতি পাঠক পাঠিকাগণ!

নাগদন্তে জন্মিয়াছে ভূমির জঠরে,
এরা তো এরূপ কাজ করিতেই পারে।
যারা মাতৃ-স্তন্য পান করে নাই, হায়,
স্নেহ, দয়া, উদারতা পাইবে কোথায়?
খড়্গ হাতে জন্মিয়াছে মুখে 'মার, মার!'

কাটাকাটি করিবে যে বিচিত্র কি তার ?
কিন্তু মানুষের কুলে জনম লভিয়া,
পূর্ব্ব পুণ্যফলে লভি মানুষের হিয়া,
মানুষে যে দূরে উহা করে পরিহার,
ভাই(য়ে) ভাই(য়ে] কাটাকাটি করে অনিবার,
সোণার সংসার ধাম ছারখার করি
বিকট আনন্দ লভে—এই ক্ষোভে মরি।

কাটাকাটি করিয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই দন্তপ্রসূত বীরগণ নিঃশেষিত হইল। তখন মন্দা কহিলেন—"রাজপুত্র, এত দূর পর্য্যন্ত তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে; এখন আইস্। কাল প্রাতে পিতার নিকট কহিও—

রাজন, সে বৃষদ্বয়ে করেছি বিজয়,
রোপেছি কর্ষিতভূমে নাগদন্তচয়।
নাগদন্তবীরগণে করেছি দমন,
প্রতিশ্রুত স্বর্ণলোম দেহ এইক্ষণ।"

এই বলিয়া মন্দা ঘরে গেলেন। পর দিন প্রাতে যথাসময়ে জয়সেন রাজা হিতেশকে অভিবাদন করিলে হিতেশ দেখিলেন, রাজপুত্রের মুখ মলিন। তিনি জানিতেন না যে, রাত্রি জাগরণে ও ক্লান্তিতে তাঁহার মুখ মলিন হইয়াছে; ভাবিলেন, জয়সেন তাঁহার পূর্ব্বদিনের কথায় ভয় পাইয়াছেন। ব্যঙ্গের স্বরে কহিলেন—"যুবক, এখন বোধ হয় তোমার চৈতন্য হইয়াছে—এ যার তার কার্য্য নয়! আমার পরামর্শ শুন, ঘরে ফিরে যাও।

স্বর্ণলোম লাভ আশে কত মহাবীর,
আমার বৃষের হাতে ত্যজেছে শরীর।
নবীন যৌবন তব দিব্য কান্তি খানি।
মাতৃকোল শূন্য কেন করিবে, বাছনি?
গৃহে যাও, উপদেশ শুনহ আমার,
অন্য উপায়েতে রাজ্য করগে উদ্ধার।"

জয়সেন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন—

"রাজন, সে বৃষদ্বয়ে করেছি বিজয়,
রোপেছি কর্ষিতভূমে নাগদন্তচয়;
নাগদন্তবীরগণে করেছি দমন;
প্রতিশ্রুত স্বর্ণলোম দেহ এইক্ষণ।"

শুনিয়া রাজা হিতেশ ও সভাসদগণ অবাক্ হইলেন। বিস্ময়ের কিঞ্চিৎ শান্তি হইলে তাঁহারা সকলে দেখিতে চলিলেন, কথা সত্য কি না। তাঁহারা দেখিলেন বৃষদ্বয় জয়সেনকে দেখিবামাত্র পালিত কুক্কুরের ন্যায় আনন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিকটে আসিল ও তাঁহার গা চাটিতে লাগিল; দেখিলেন ভূমি কর্ষিত হইয়াছে ও কর্ষিত ভূমির উপর নাগদন্তবীরগণের মৃতদেহ সকল পতিত রহিয়াছে। দেখিয়া সকলে রাজার মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাঁহার মুখপানে তাকাইলেন। হিতেশ ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন; ক্রোধ কম্পিত স্বরে কহিলেন—

"কোন বাহুবলে তুই, বিদেশী বেল্লিক,
এ কাজ করিলি? তোরে ধিক্, শত ধিক্।

স্বর্ণলোম নিবি ? রোস্—থাম্ কিছুকাল,
শৃগালেরে খা(ও)য়াইব তোর রে কঙ্কাল !
দূর ! দূর ! এ পাপিষ্ঠে, কোটাল্ !—প্রবীর !
এখনি নগর হ'তে করে দে বাহির।"

মন্ত্রী চুপে চুপে হিতেশকে পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, ক্রোধ সম্বরণ করুন, এ বালক আপনার ক্রোধের উপযুক্ত নহে। বিশেষ, সে একাকী ও নিঃসহায় নহে; আমি জানিতে পারিয়াছি, ভারতের প্রধান প্রধান বীরগণ তাঁহার সহচর ও সহায়। আর এক কথা এই যে, বীরত্ব বলেই হউক, বা যাদুবলেই হউক, যে ভগবান মহাদেবের আশ্রিত এই বৃষদ্বয়কে বশীভূত করিতে পারিয়াছে ও বাসুকীর প্রভাব বিশিষ্ট বীরগণকে দমন করিতে পারিয়াছে, সে সামান্য পাত্র নহে—সে দেবগণের আশ্রিত। ইহাকে বলে নহে, ছলে বিমুখ করিতে হইবে।" হিতেশ বুঝিলেন। বুঝিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন।

তার পর জয়সেন যখন আপনার নির্দ্দিষ্ট গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন এক নির্জ্জনপথে মন্দা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন—

"চিন্তা নাই, রাজপুত্র, আছি হে সহায়,
মধ্যরাত্রে এইস্থানে এসো পুনরায়।"

মধ্যরাত্রে মন্দাতে ও জয়সেনে পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে মন্দা তাঁহার হাত ধরিয়া উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। মন্দা কহিলেন— "আজ নাগের সহিত রণ—তোমার তরবারে বেশ ধার আছে

জয়সেন ও মন্দা।

কৌতুক-কাহিনী—২১৩ পৃষ্ঠা।

তো ?” জয়সেন তাঁহার তীক্ষ্ণধার তরবারি দেখাইলেন, চন্দ্রালোকে উহা ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। মন্দা কহিলেন—“ভাল ; কিন্তু, যুবরাজ, তরবারে এ নাগের গলা কাটিবে না ; ইহাকে বধ করিতে অন্যরূপ অস্ত্র চাই। এই লাঠিগাছটা লও, ইহা দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইবে।” এই বলিয়া মন্দা তাঁহার হাতে এক গাছি সরু বাঁকা লাঠি দিলেন। রাজপুত্র কহিলেন—“মন্দা, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি। এখানে সাধারণ অস্ত্রে ও সাধারণ বলে কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহা আমি কালই বুঝিতে পারিয়াছি। রাজপুত্রি, তুমি আমার ভাগ্যলক্ষ্মী, তোমার অনুগ্রহ বিনা আমার কোন কার্য্যই সফল হইত না ; আমি কি দিয়া তোমার এ ঋণ পরিশোধ করিব ?” মন্দা হাসিয়া কহিলেন, “ধার কর্জ্জের কথা অবসর মতন হবে, এখন চল। ঐ দেখ, উদ্যান দেখা যাইতেছে। দেখিতেছ না কি স্বর্ণলোমাবৃত চর্ম্মের ও কনক পুষ্পগণের আভায় গগন উদ্ভাসিত হইয়া আছে ?”

কিছুকাল মধ্যে তাঁহারা উদ্যানপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। জয়সেন মুগ্ধ হইয়া দেখিলেন—

> স্বর্ণলোমাবৃত চর্ম্ম অশোকশাখায়,
> ভাতিছে কনক ফুল তার চারি ভায় ;
> শশী তারাদল সহ যেন রে খসিয়া,
> ভূমে তরু শাখে শাখে রয়েছে ঝুলিয়া !

রাজপুত্র মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য ; এমন সময়ে মন্দা কহিলেন—“রাজপুত্র, সাবধান, সাবধান।

ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ ওই শুনিছ না কাণে ?
ফণা বিস্তারিয়া দেখ চাকিল বিমানে;
ত্বরা করি যষ্ঠি অস্ত্র করহ ধারণ,
নতুবা নাগের হাতে হারাবে জীবন।"

রাজপুত্র চকিতের ন্যায় যষ্ঠি ধারণ করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার যষ্ঠি শত সূর্য্যের দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তাহার প্রখর তেজে সর্প অত্যন্ত বিকল হইতেছে। তখন যেই তিনি উহা দ্বারা সর্পের মস্তকে আঘাত করিলেন অমনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় সে দগ্ধ হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল।

এতক্ষণে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর হইল। মন্দার পরামর্শে জয়সেন অবিলম্বে অশোক তরুর শাখা হইতে স্বর্ণলোমাবৃত মেষ-চর্ম্ম নামাইয়া লইলেন ও উহা মাথায় ধরিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মন্দা কহিলেন—"রাজকুমার, কিছুকাল আনন্দ সম্বরণ কর; শীঘ্র এ রাজ্য হইতে পলায়ন কর। আমার পিতা তোমার প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া আছেন; এখনো তোমার অনেক বিপদ হইতে পারে।" জয়সেন নৃত্য থামাইয়া কহিলেন—"আর তুমি—মন্দা? তুমিও আমার সঙ্গে চল; নতুবা আমি যাইব না;

তুমি যদি নাহি যাও, মন্দা, অবহেলে
ফেলে দিব স্বর্ণলোম সাগরের জলে;

অবহেলে এ জীবন করিব বর্জ্জন,—
রসাতলে যাক্ মম রাজ্য, সিংহাসন।"

মন্দা মৃদুমন্দ হাসিয়া কহিলেন—"চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" তখন দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। জয়সেনের সহচর বীরগণ সকলে দাঁড় ধরিয়া বসিলে অরবিন্দ বীণায় গান ধরিলেন—

গাও, বীণা, গাওরে এখন,
ধন্য ধন্য বীর যিনি সফলযতন।
উৎসাহ, উত্তম যাঁর, সিদ্ধি ক্রীতদাসী তাঁর,
তাঁহারে সহায় সদা দেবদেবীগণ।
করা'য়ে অমৃত পান অমরত্ব করে দান
কীর্ত্তি তাঁরে স্নেহময়ী মায়েরি মতন।
গাও, বীণা, গাওরে এখন। (১)

তরি চলিল; যথাসময়ে অক্ষয়পুরীর ঘাটে উপস্থিত হইল। বীরগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে তীরে নামিলে সহসা তরি কাষ্ঠ-পুত্তলিকা সহ সাগরজলে নিমজ্জিত হইল। তখন দৈববাণী হইল—

"আমি পুত্তলিকা, আমি মন্দা, যুবরাজ,
আমি ভাগ্যলক্ষ্মী তব, কহিলাম আজ।
আমরা সকলে এক; আশীর্ব্বাদ করি
সুখে থাক, জয়সেন, রাজদণ্ড ধরি।

(১) রাগিণী পীলু বারোয়া—তাল, ঠুংরী।

যতনে তুষিও, বৎস, নরে, দেবতায় ;
ধর্ম্মপথে আমি তব রহিব সহায়।”

মন্দা জয়সেনের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন, এই বাণী হইতে হইতেই অন্তর্হিতা হইলেন।

ও যাঃ! অত বড় একটা কাজ খারাপি হইল! আমি মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, শ্রীমতী মন্দাকে শ্রীমান জয়সেনের সহিত বিবাহ দিয়া আমার পাঠকপাঠিকাগণের প্রাণ পুলকিত করিব, তা হইল না! ইতিহাসে যাহা নাই, তাহা কেমন করিয়া করি? মন্দা দেবতা, অরুণার মত মানুষ নহেন। মানুষী হইলে আর আমাদের বলিবার অপেক্ষা সহিত না। জয়সেনের মত একটা রাজপুত্র বর মন্দা ঠাকুরাণী লুফিয়া লইতেন।

সে সব কথা যাক্, যাহা সত্য সত্য ঘটিয়াছিল, তাই বলি। মন্দা কে, জয়সেন এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। পরে পুলক অঙ্গীকারানুসারে রাজ্য পরিত্যাগ করিলে রাজকুমার জয়সেন মহারাজ জয়সেন নামে পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন।

পাতালেশ্বর তমোরাবণ।

উর্ব্বরা দেবীর একটীমাত্র মেয়ে কুসুমিকা; বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর। তাঁর আর কোন সন্তান সন্ততি নাই। তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে বাস করিতেন। তিনি কাজ করিতেন কি জান? পৃথিবীতে যত শস্য হইত, যত ফুল ফুটিত, ফল পাকিত, লতা দুলিত, গাছ গজাইত, সকলি তাঁরি কাজ—তাঁহার সাহায্য ব্যতীত এ সব কিছু হইত না। অতএব তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, বিন্দুমাত্র অবসর পাইতেন না। কাজেই মেয়েটীকে যত্ন করা হইত না। মা থাকেন এখানে সেখানে, মেয়ে আর কি করিবে? একলাটী তো আর দিন রাত্রি চুপ করিয়া ঘরের ভিতরে বসিয়া থাকা যায় না? কাজেই সে সমুদ্রতীরে যাইয়া বরুণ দেবের মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করিত। সে জলের ধারে যাইয়া তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহারা জলের নীচে থেকে ভাসিয়া উঠিত, এক একটি ছোট ঢেউয়ের উপর চড়িয়া তীরে আসিত; তখন সকলে মিলিয়া প্রবাল, শামুক, ফুল ইত্যাদি দিয়া খেলা করিত। বরুণের মেয়েরা শুকনতে আসিত না, আসিলে

তাদের ফাঁপর ফাঁপর করিত—তাহারা দম ফাটিয়া মরিবার মত হইত ; কুসুমিকা সেই জন্য অর্দ্ধেক জলে অর্দ্ধেক স্থলে থাকিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিত।

একদিন উর্ব্বরা দেবী তাঁহার কাজে গিয়াছেন, কুসুমিকা সমুদ্রজলে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া জলে ঢেউ দিতে দিতে সখীগণকে ডাকিতেছে—

"ওলো তোয়া, ওলো বীচি, ও তরি, প্রবাল,
আয় ভাই, খেলা করি, আয় না সকাল।"

তখন তোয়া ও প্রবাল জলের নীচে থেকে মাথা তুলিল ; বীচি ও তরঙ্গিনী দুইটা ঢেউয়ের উপর চড়িয়া আসিয়া তীরে পঁহুছিল। প্রবাল কুসুমিকাকে অনেক গুলি উজ্জ্বল মুক্তা দেখাইয়া বলিল—

"আঁচল ভরিয়া এনেছি, ভাই,
আয় মালা গেঁথে তোরে পরাই।
মুকুতায় তোরে সাজিবে ভাল,
রূপের ছটায় করিবি আলো।"

বরুণের মেয়েরা রাশি রাশি মুক্তার মালা গাঁথিয়া কুসুমিকার গলে, চুলে, হাতে, কটিতে—নানা স্থানে পরাইল। সুন্দরী কুসুমিকা পুষ্পিতা লতার মতন ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। সেও তাহার সখীদিগকে কহিল—

"তোরাও তাহলে বোস্‌না, ভাই,
ফুল তুলে আমি আনিগে যাই ;

কুসুমিকা ও বরুণদেবের কন্যাগণ।

কৌতুক-কাহিনী—২১৮ পৃষ্ঠা

নানাবিধ ফুলে সাজাব সবে
চরাচর আজ মোহিত হ'বে।”

এই বলিয়া বালিকা তীরভূমি পার হইয়া বনের দিকে ছুটিল। সে বনে নানাবিধ ফুল ফুটিত—

জাতি, যুঁথী, মালতী, সেফালি, কুরুবক,
অতসী, অপরাজিতা, টগর, চম্পক,
অশোক, কিংশুক, দ্রোণ, কমল, পলাস,
জবা, বেলী, সূর্য্যমুখী, নিকুঞ্জবিলাস।

আরও কত ফুল—অত কি নাম করা যায়? আর করিলেই কি আর তোমাদের মনে থাকিবে? কুসুমিকা আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিতে লাগিল ও ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে গভীর বনে উপস্থিত হইল। তবু আশা আর মিটে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—

একটীও ফুল যেথা ছিল না শাখায়,
একটী কলিও ক্ষুদ্র ছিল না যেথায়,
কুসুমিকা যেই সেথা করে আগমন,
গায়ের বাতাসে ফুল ফোটে অগণন!

কুসুমিকা দেখিল অল্প দূরে একটী অতি মনোহর ভূমিচম্পক ফুটিয়া সৌরভে দিক আমোদিত করিতেছে। এত বড় ও এতসুগন্ধ ফুল তো সে কখনো দেখে নাই! আগ্রহের সহিত ফুলটী তুলিতে যাইয়া বুঝিল সেই স্থানের মাটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, মাটির নীচে কেমন গুড়্ গুড়্ শব্দ হইতেছে। বালিকার একটু

ভয় হইল, কিন্তু তবু ফুলটীর আশা ছাড়িতে পারিল না। ফুলটী বৃন্ত সহিত টানিল—একি, ফুল তো উঠে না! খুব জোরে টানিতে লাগিল, তাহাতে ফুল গাছের চারি দিকের মাটি ফাটিল। যখন ফুল উঠিল তখন সেই স্থানে একটী গহ্বর হইতে ঝা করিয়া একখানি রথ উঠিয়া পড়িল—

কনকের রথ খানি সুন্দর আকার,
রজতের চাকা, চূড়া হীরকের তার।
দুই কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব রথের বাহন,
পবন সমান বেগে করে আকর্ষণ।

তোমরা সহজেই বুঝিতে পার কুসুমিকা এই দৃশ্য দেখিয়া কিরূপ চমকিত হইল; চমকিত হইবার আরো কথা ছিল; বলিতেছি; রথ শূন্য নহে। রথে এক জন নবীনবয়স্ক পুরুষ বসিয়াছিলেন, তাঁর—

সুন্দর গঠন খানি, সুন্দর নয়ন,
সকলি সুন্দর কিন্তু মলিন বরণ;
মণি, মুক্তা, প্রবাল, হীরার অলঙ্কার,
স্বর্ণ, রৌপ্য আচ্ছাদিত শরীর তাঁহার।

তিনি চমৎকৃতা কুসুমিকাকে কহিলেন—"কুসুমিকে, আমি তোমাকে চিনি, তুমি আমার সঙ্গে আমার রাজধানীতে যাইবে? চল।" আমি এই যুবকের পরিচয় দিতেছি, শুন। পাতালের মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের কথা শুনিয়াছ তো? ইনি সেই অহিরাবণের পুত্র তমোরাবণ। পাতালে ইঁহার রাজ্য; মাঝে

মাঝে মর্ত্ত্যে বেড়াইতে আসেন। মর্ত্ত্যে আসিতে হইলে রথসুদ্ধ আজিকার মত মাটি ফুড়িয়া উঠিয়া পড়িতেন। মর্ত্ত্যে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেন না, সূর্য্যের কিরণ তাঁহার চক্ষে বড় সহ্য হইত না।

কুসুমিকা নির্ব্বাক্ নিশ্চল হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে—

অর্দ্ধেক খুলেছে মুখ করিতে চীৎকার,
বাহু যুগ উর্দ্ধপানে, চকিত নেহার।

এমন সময়ে তমোরাবণ তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া রথে তুলিয়া লইলেন। এ আর এক সীতাহরণের পালা। হবে না কেন? এ তমোরাবণ তো সেই পাপিষ্ঠ দশানন রাবণেরই জ্ঞাতি? বালিকাকে রথে তুলিয়াই পাতালেশ্বর সারথিকে হুকুম দিলেন—"খুব বেগে চালাও।" তখন রথ বিদ্যুৎবেগে ছুটিল। কুসুমিকার এতক্ষণে কথা ফুটিল। সে প্রাণপণে 'মাগো! মাগো!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

"মা, আমায় দেখ গো মা, নিয়ে যেগো যায়,
ডাকি আমি, কুসুমিকা রহিলে কোথায়!"

তাহার ক্রন্দনে দশ দিক্ আকুল হইল—

সে কাতর ধ্বনি শুনি গৃহস্থের নারী
আপন শিশুকে বক্ষে লয় তাড়াতাড়ি;
ধেনু হাম্বা রব করে বৎস পানে ধায়,
শাবক লইয়া পক্ষী কুলায় লুকায়।

তমোরাবণ কুসুমিকাকে বলিলেন—"কান্দ কেন? আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না। তোমাকে খুব ভালবাসিব। তোমাকে আমার রাজধানীতে লইয়া যাইতেছি; সেখানে রাজরাণী হইয়া থাকিবে। সোণা, রূপা, হীরা, মাণিক দিয়ে খেলা করিবে; দেখ, আমার গায়ে কত হীরা; এ গুলি নেবে?—এই ন্যাও।" এই বলিয়া তিনি কুসুমিকাকে এক মুঠা হীরা খুলিয়া দিলেন। বালিকা রাগ করিয়া সে গুলি রাস্তায় ছড়াইয়া ফেলিয়া বলিল—

"হীরা, মুক্তা, সোণা, রূপা চাই না ও ছাই
আমাকে নামা'য়ে দেও, মার কাছে যাই।"

সে যে আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছিল সে গুলিও রাস্তায় ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল; তার মনে আশা, তার মা সেই গুলি দেখে সে কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা জানিতে পারিবেন।

রথ তত ক্ষণে মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া এক অন্ধকার গহ্বর-মুখে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে সেই সোণার রথের হীরার চূড়া চতুর্দ্দিক আলো করিতে করিতে উল্কার মত ছুটিল। অন্ধকার পাইয়া তমোরাবণের হৃদয় ও মুখ খুব প্রফুল্ল হইল। তিনি কুসুমিকাকে নানারূপে আদর করিতে লাগিলেন—তাঁর রাজ্য ঐশ্বর্য্যের কথা কহিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুসুমিকা খালি এক কথা বলে—

"আমাকে নামা'য়ে দেও, মার কাছে যাই।"

রথ পাতালেশ্বরের রাজধানীতে উপস্থিত হইল। কুসুমিকা দেখিল—

স্বর্ণের সিংহদ্বার, কপাট উপরে
মণি, মুক্তা, হীরক বসান থরে থরে।
রজত প্রাচীরে বেড়া চৌদিকে নগর,
স্বর্ণের সৌধগুলি অতি মনোহর।
নগরের পথগুলি বেন্ধেছে রূপায়,
পথে পথে মণি মুক্তা গড়াগড়ি যায়।
সে দেশে নাহিক সূর্য্য চন্দ্রের উদয়,
হীরা মাণিক্যের তেজে সদা আলো হয়।

রাজার অন্তঃপুরের দরজায় রথ থামিলে তমোরাবণ কুসুমিকাকে ধরিয়া নামাইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন। চল, আমরা দেখিগে কুসুমিকার মা উর্ব্বরা দেবী কি করিতেছেন।

যখন কুসুমিকাকে নিয়ে যায় তখন উর্ব্বরাদেবী এক গমের ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া শস্যগুলি পাকাইতেছিলেন। কুসুমিকার কাতর চীৎকার একটু যেন তাঁর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছু বুঝিতে পারেন নাই। তবু প্রাণটা কেমন চঞ্চল হইল; তিনি আর কাজে মন দিতে পারিলেন না। শস্যগুলিকে আধপাকা অবস্থায় ফেলিয়া গৃহের দিকে চলিলেন। তোমরা কি মনে কর উর্ব্বরা দেবী হাঁটিয়া চলেন? অবশ্যই না; হাঁটিয়া চলিলে সমস্ত পৃথিবী বেড়াইবেন কিরূপে? সমস্ত পৃথিবীরই ফল, ফুল, শস্য, লতা, পাতার ভার যে তাঁর হাতে! তাঁর একখানি ক্ষুদ্র রথ ছিল; নীর ও তাপ নামে দু'টী ঘোড়া সে রথখানিকে উড়াইয়া লইয়া চলিত। উর্ব্বরা দেবী অল্পক্ষণের

মধ্যেই গৃহে পঁহুছিলেন। পঁহুছিয়াই "ও কুসুমিকা! ও কুসুমিকা!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন;—শূন্য ঘর, কে উত্তর দিবে? দেবী রথ হইতে নামিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিলেন, তাঁর প্রাণ বড় ব্যাকুল হইতেছিল। সমুদ্রের তীরে যাইয়া দেখেন যে তোয়া, বীচি, তরঙ্গিনী প্রভৃতিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউয়ের মাঝে টুক্‌টুকে সুন্দর মুখ ক'খানি ভাসাইয়া তীরের দিকে চাহিয়া আছে। উর্ব্বরা দেবীকে দেখিয়া তাহারা কহিল—

"ওগো, কুসুমিকা সখী কেন গো আসে না,
তুমি কি আসিতে তারে করিয়াছ মানা?"

শুনিয়া দেবীর প্রাণ উড়িয়া গেল। তবে কুসুমিকা তো এখানে নাই; হায়, কোথায় গেল! কুসুমিকাকে তিনি খুঁজিয়া পাইতেছে না শুনিয়া ও তাঁর অত্যন্ত ব্যাকুল ভাব দেখিয়া বরুণের মেয়েরাও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে ফুল তুলিতে গিয়া কুসুমিকা যে আর ফিরিয়া আসে নাই তাহারা তাহা বলিল। শেষে আবার কহিল—

"যাও গো বনের দিকে, বনের(ই) ভিতরে,
আমাদের মনে লয়, পাইবে সখীরে।
আমরাও যাইতাম সখীর সন্ধানে
কিন্তু যে গো শুষ্ক ভূমে বাঁচি না পরাণে।
আমরা রহিনু সবে তাহার আশায়,
কুসুমিরে পাইলেই পাঠিও হেথায়।"

উর্ব্বরা দেবী পাগলিনীর মত বনের দিকে ছুটিলেন। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। তিনি হাতে একটী মশাল লইলেন। সে মশালটীর এমন গুণ যে, রাত্রিতেও জ্বলে, দিনেও জ্বলে—নিভে না। কখনো তাতে তেল দিবার প্রয়োজন হয় না। দেবী মশালকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"যত দিন তনয়াকে না পাই আবার
উজ্জ্বল জ্বলিও সদা, মশাল আমার।"

বনের মধ্যে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলেন; কুসুমিকাকে পাওয়া গেল না। সে রাত্রি কোনরূপে প্রভাত হইল। প্রভাতে দেবী বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে চলিলেন। পথে যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন—

"তোমরা কি দেখেছ গো কুসুমে আমার,
কোন্ পথে গেলে দেখা পাইব বাছার?"

এক ধীবর কহিল—"দেবি, আপনার মেয়েকে সমুদ্রের তীরে থেকে বনের দিকে যাইতে দেখিয়াছি, আর কিছু দেখি নাই।" কোন কোন কৃষক কহিল—"আপনার মেয়েকে বনে আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিতে দেখিয়াছি, আর তো কিছু বলিতে পারি না।" তাহারা সকলে উর্ব্বরা দেবীকে চিনিত, তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া কেহ কেহ দুই চারি ফোটা চক্ষের জলও মুছিল। তিনি দিবা দু'প্রহরে, কখনো রাত্রির আঁধারে গৃহস্থদের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—

"এদিকে কি এসেছিল কুসুম আমার ?
কোন্ পথে গেলে দেখা পাইব বাছার ?"

গৃহস্থবধূরা তাঁহাকে আদর করিয়া বসিতে দিত, আহার ও বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিত; কিন্তু তিনি বসিতেনও না আহারবিশ্রামও করিতেন না। কখনো কোন বড়লোকের দরজায় যাইয়া ঘা মারিতেন; বড় লোকের অধিকতর বড়লোক চাকরেরা প্রথম মনে করিত অন্য কোন বড়লোক আসিয়া প্রবেশ চাহিতেছেন বুঝি। কিন্তু যখন দরজা খুলিয়া তাহারা দেখিত একটা দুঃখিনী স্ত্রীলোক—মেয়ের খোঁজে আসিয়াছে, তখন তাহারা কেহ কেহ বা উপহাস করিয়া কহিত—

"মেয়েটা সুন্দরী তো গা ? বয়সে তো কচি ?
বড় সোহাগিনী মেয়ে আইবুড় বুঝি ?
এ সব আদুরে মেয়ে প্রাই(ই) ব'য়ে যায়—
ভাবনা করো না বাছা, পাবে পুনরায়।"

কেহ কেহ বা রাগ করিয়া তাহাকে দূর হইয়া যাইতে বলিত—

"দুর, মাগি, আমরা কি লঙ্কার রাবণ,
তোর সোহাগের সীতা করেছি হরণ ?"

দেবী বিনা বাক্যব্যয়ে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেন। পথে গৃহস্থের বালকদিগকে খেলা করিতে দেখিলে তিনি তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া তাহাদের মায়ের কাছে দিয়া আসিতেন। গৃহস্থবধূকে বলিতেন—

"ওগো বৌ, বুকে বুকে রাখিও দুলাল,
কভু করিও না যেন চক্ষের আড়াল।"

তাহারা শুনিয়া ছল ছল নেত্রে দেবীর প্রতি তাকাইয়া থাকিত।

তিনি যে কেবল মনুষ্যগণকেই মেয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা নহে। বনপথে যাইতে যাইতে তমাল বৃক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের কাণ্ডভেদ করিয়া বনদেবীরা বাহির হইত; নির্ঝরিণীকে জিজ্ঞাসা করিলে জলের নীচে থেকে জল-দেবীরা বাহির হইত। তাহারা সকলেই দুঃখিতস্বরে কহিত—

"নাগো বাছা, কুসুমিকা আসেনি হেথায়।"

সেকালে মনুষ্য ছাড়া আরো নানা প্রকার জীব ছিল— মানুষের মত কথা কহিত ও মানুষের সহিত মিশামিশি করিত। এখন তো আর তাদিগে পাপচক্ষে দেখিতে পাই না? তারা থাকিলেও এখন আর আমাদিগের দৃষ্টিপথে আসে না, আমাদের সঙ্গে কথা কয় না।

উর্ব্বরা দেবী চলিতে চলিতে বিপশা রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজবাটীতে রাণী বড় বিমর্ষ হইয়া আছেন। তাঁর একটীমাত্র শিশুপুত্র, সেও সর্ব্বদা পীড়িত থাকে; তার শরীর শুষ্ক, মুখ মলিন, দিনরাত কেবল কান্দে। দেশের বড় বড় কবিরাজ ও ধাত্রীগণ কত চেষ্টা করিয়াছে, ছেলের শরীর শোধ্‌রায় না। রাণী উর্ব্বরা দেবীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সকল কথা কহিলেন। দেবী ছেলেপুলের কথা হইলে মনোযোগ

পূর্ব্বক শুনেন, কেননা তিনি সন্তানের মমতা বুঝেন। তিনি রাণীকে কহিলেন—"আপনি যদি আপনার শিশুটীকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া দেন—আমি যা ইচ্ছা তাই খাওয়াইব পরাইব, যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে রাখিব, আপনারা কোন কথা না বলেন, বাধা না দেন—তবে আমি ইহাকে ভাল করিয়া দিতে পারি।" রাণী তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন উর্ব্বরা দেবী গৃহের এক কোণে তাঁহার হাতের মশালটী রাখিয়া রাজশিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন ও সেই দিন অবধি তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের কথা শুন, সেই দিন অবধি শিশুরও চেহারা ফিরিল, তার কৃশ ও দুর্ব্বল শরীর পুষ্ট ও সবল হইতে লাগিল। তার ক্রন্দন গেল, এখন কেবল খল্ খল্ করিয়া দিবারাত্র হাসে ও লম্প ঝম্প দেয়। উর্ব্বরা দেবী মুহূর্ত্তকালও শিশুটাকে কারো হাতে দেন না—সর্ব্বদা নিজের কাছে রাখেন। প্রতিবেশীরা সকলে চমৎকৃত হইল। তারা রাণীকে জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁ রাণীমা, আপনার ধাত্রী কি ঔষধে রাজপুত্রকে এত অল্পদিনের মধ্যে এমন সুন্দর ও সবল করিল—না কি যাদু জানে ? রাণীর নিজেরও এ বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল। তিনি উর্ব্বরা দেবীকে কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"কেমনে গো দেখাইলে এ আশ্চর্য্য ফল ?
আমায় বল না, দাই, তোমার কৌশল ;
তুমি যবে চলে যাবে দু'দিনের পরে
বাছার অসুখ হ'লে বাঁচাব কি করে ?"

দেবী এ সকল কথার কোন উত্তর করিতেন না। বড় বিরক্ত করিলে কখনো বা কহিতেন—"তোমার শিশুর আর কখনো কোন অসুখ হইবে না—চিন্তা নাই।" কিন্তু রাণী কি তাহা শুনেন? স্ত্রীলোকের কৌতূহল; একবার উদ্দীপ্ত হইলে সহজে থামে না। তিনি যখন আদর করিয়া, অর্থলোভ দেখাইয়া, শেষে ভয় দেখাইয়াও ধাত্রীর নিকট হইতে কিছু জানিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে স্থির করিলেন—লুকাইয়া দেখিতে হইবে, মাগী কি করে, কি ঔষধ খাওয়ায়, কি পথ্য করায়, কোথায় শোওয়ায়; আর যদি মন্ত্র তন্ত্রই কিছু করে, তাহাও লুকাইয়া থাকিয়া শিখিতে হইবে। মনে মনে এই দুর্ব্বুদ্ধি স্থির [করি]য়া তিনি অবসরমত ধাত্রীর গৃহে খাটের নীচে লুকাইয়া থাকিলেন। সন্ধ্যার সময় ধাত্রী শিশুকে কোলে লইয়া ঘরে আসিল। কিছুকাল পরে একটা পাত্র হইতে কতকটা তৈল লইয়া উহা শিশুর শরীরে খুব স্বচ্ছন্দ করিয়া মাখিল। তার পর একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিল, তাহাতে অগ্নি ভীষণ তেজে জ্বলিতে লাগিল। ধাত্রী তখন শিশুটীকে চারি হাত পায়ে ধরিয়া তুলিয়া কুণ্ডের ঠিক মধ্যস্থানে ফেলিয়া দিল। শিশু অগ্নিতে পড়িয়া হাত পা ছুড়িয়া মহানন্দে ক্রীড়া করিতে ও খল্ খল্ শব্দে হাসিতে লাগিল। কিন্তু রাণাতো ইহা দেখিলেন না; তিনি "কি করিলি! কি করিলি! সর্ব্বনাশ করিলি!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে খাটের নীচে থেকে বেগে বাহির হইয়া অগ্নির মধ্য হইতে শিশুকে তুলিয়া লইলেন—এই কার্য্যে তাঁহার নিজের

হাত দু'খানি আধপোড়া হইল। শিশু মায়ের কোলে থাকিয়া কান্দিতে লাগিল। রাণী বিস্মিতা হইয়া দেখিলেন, তার কেশগাছিও পোড়ে নাই। সে দিব্য আছে। রাণী বড় অপ্রতিভ হইলেন। তখন উর্ব্বরা দেবী উঠিয়া কহিলেন—

"মা হয়ে শিশুর আজি যত অপকার
করিলে গো রাণি, তার নাহি প্রতিকার।
এই তৈলে সিক্ত হয়ে অগ্নির ভিতরে
এই শিশুপুত্র তব প্রতিদিন(ই) পোড়ে।
এইরূপে পোড়াইলে দিন কত আর
অমর হইত, বাছা, তনয় তোমার।
তুমিতো বুঝিলে নাগো ; বাধা দিলে যবে
অমর হলো না আর—দীর্ঘজীবী হবে।
আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে এখন
আমি যাই—ধরাময় করিগে ভ্রমণ।"

এই কথা বলিয়া উর্ব্বরা দেবী মশাল হাতে লইয়া গৃহের বাহির হইলেন। রাণী পাছে পাছে আসিয়া কত অনুনয়বিনয় করিলেন—

"ওগো দাই, রাগ, বাছা, করিও না আর,
এ ছেলে আমার নয়, এ ছেলে তোমার ;
যাহা ইচ্ছা হয় কর—পোড়াবে পোড়াও,
কথাটীও কহিব না ; ফের—মাথা খাও।"

কিন্তু দেবী কোন কথা শুনিলেন না ; রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এতদিন রাজশিশুটীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া দেবী কুসুমিকার শোক কতকটা বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; এখন আবার শোকাগুণ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পর্ব্বত, কানন, প্রান্তর শোকধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রবল ব্যাত্যাতাড়িত শুষ্ক পত্রের ন্যায় পৃথিবীময় বেড়াইতে লাগিলেন—

নিশীথ নিস্তব্ধে তাঁর শুনিয়া ক্রন্দন
চমকিত হয়ে গৃহী জাগিত কখন।
দেবী কান্দিতেন—“কোথা কুসুমিকা—মাই !”
প্রতিধ্বনি উত্তরিত “কুসুমিকা নাই !”

উর্ব্বরা দেবী একদিন এক পর্ব্বতগহ্বরে উপস্থিত হইলেন। সে স্থান ঘোর অন্ধকার ও অত্যন্ত শীতল ; কখনো তথায় সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করে না। তাঁহার বোধ হইল গহ্বরের ভিতর হইতে রোদনশব্দ আসিতেছে। তিনি মনে করিলেন কোন সমদুঃখী তথায় আছে বুঝি। এই মনে করিয়া তিনি গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, এক বৃদ্ধা একখণ্ড প্রস্তরের উপরে বসিয়া অতি করুণস্বরে রোদন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে আপনার পাকা চুলগুলি মুঠে মুঠে ছিঁড়িতেছে ও হাত পা আছ্‌ড়াইতেছে। বৃদ্ধার শরীর জরাজীর্ণ, চক্ষু কোটরগত, ও সমস্ত শরীর কালিমাব্যাপ্ত। দেবী ব্যথিত হইয়া অতি কোমল স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তুমি কেগো, বৃদ্ধা, কেন এ শোকরোদন,
তোমারো কি প্রাণে, ব্যথা আমারি মতন ?

তুমিও কি হারায়েছ নয়নের মণি—
প্রাণের পুত্তলি কন্যা—কহ তা' জননি ?"

বৃদ্ধা ক্ষণকালের জন্য ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া মুখ তুলিয়া অতি বিমর্ষভাবে নীরবে রহিল; পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভগ্নকণ্ঠে কহিল—

"প্রাণের পুত্তলি কন্যা ? সেকি গো আবার ?
ওসকল কোন দিন (ও) ছিল না আমার।
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন
কোন দিন দেখি নাই, জানি না কখন।
কেন কান্দি ? এ জিজ্ঞাসা করিয়াছ ভাল—
ক্রন্দন ব্যতীত আর কি করিব বল ?
দীর্ঘশ্বাস, চুলছেঁড়া, আছাড়বিছাড়,
কাতর ক্রন্দন ছাড়া কি করিব আর ?
এ সকলে চিরকাল বড় সুখ পাই,
যুগে যুগে এই সব করিয়াছি, ভাই!
এই দেখ, কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধপ্রায়
চূর্ণ করিয়াছি হাড় আছাড়ের ঘায়।
অশ্রুজলে কত শিলা করিয়াছি ক্ষয়,
দীর্ঘশ্বাসে নাসারন্ধ্র দেখ ক্ষতময়।
বিষাদের মত সুখ নাহি বুঝি আর,
দোঁহে মিলি করি এসো কাতর চীৎকার!

নান্ম ছাঁদে বিনাইতে না জান কৌশল,
কি ব'লে কাঁদিতে হবে শিখাব সকল;
কি ভাবে বদন, চক্ষু করিবে কুঞ্চন,
কি ভাবে ছিঁড়িবে চুল, করিবে আঙ্কন;
দু'দণ্ডে শিখাব সব এসো হেথা, ভাই,
আহাহা! দুঃখের মত সুখ আর নাই!"

এই বলিয়া সে আবার মহা বেগে কান্দিতে আরম্ভ করিল। উর্ব্বরাদেবী বৃদ্ধাকে চিনিলেন; তার নাম বিষাদিনী—মূর্ত্তিমতী দুঃখ; সে এক অপদেবতা; সে মানুষের পরম শত্রু; একবার যার হৃদয়কে আক্রমণ করে তার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে—তার অকালমৃত্যু হয়। উর্ব্বরাদেবী গহ্বর হইতে সত্বর পলায়ন করিলেন।

কন্যার অন্বেষণে এক বৎসরের অধিক কাল গত হইল। এদিকে, তাঁর যত্নের অভাবে ক্ষেত্রে শস্য হয় না, বৃক্ষে ফল ফলে না, ফুল ফোটে না—এমন কি, ঘাসের গাছটাও গজায় না। পৃথিবী মহা মরুভূমে পরিণত হইল। মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল—মানুষ, পশু, পক্ষী আহার অভাবে প্রাণে মরিতে লাগিল। উর্ব্বরা দেবীর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি বিষাদিনীর গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে মনে ভাবিলেন, অরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেড়ায়, দেখি সে আমার কুসুমিকার কোন সন্ধান বলিতে পারে কি না। কয়েক দিন অনবরত পথ হাঁটিয়া দেবী অবশেষে উদয়াচলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি; রাত্রি প্রভাত হইলে অরুণ

দেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অরুণদেবের কি সুন্দর প্রফুল্লমূর্ত্তি!

উজ্জ্বল সিন্দুর সম সুন্দর বরণ,
চির-প্রফুল্লতা মাখা কমল বদন;
জগৎ প্রফুল্ল হয় সে মুখ দেখিলে,
পরিপূর্ণ হয় বিশ্ব আনন্দ কল্লোলে।

উর্ব্বরাদেবীকে দেখিয়া অরুণদেব ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন—"দেবি, আপনি এখানে কেন?

ধরিত্রী তো অকাতরে দেন ফুল ফল,
জীব তো কুশলে আছে—স্বচ্ছন্দে সকল?
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কিম্বা পঙ্গপাল
করেনি তো শূকে আর মুষিকে জঞ্জাল?"

দেবী কহিলেন—"আমি বড় বিপন্ন, পৃথিবীতে কি হইতেছে না হইতেছে কিছু দেখি না।" তারপর কন্যা কুসুমিকাকে হারাণের কথা ও তাহার অনুসন্ধানে আপনার সর্ব্বত্র ভ্রমণের কথা সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। শুনিয়া অরুণদেব কহিলেন—"দেবি, আপনার কন্যাকে পাতালপতি তমোরাবণ লইয়া গিয়াছেন—কুসুমিকার অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে নিজ রথে তুলিয়া নিজ রাজধানী লইয়া গিয়াছেন। আপনি ভাবনা করিবেন না—আপনার কন্যার কোন অহিত হইবে না; তমোরাবণ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। পরে ব্যস্ততার সহিত—

"কথা কহিবার, দেবি, নাহি অবসর,
রথ সাজাইতে হবে মুহূর্ত্ত ভিতর ;
এখনি তপনদেব করিলে উত্থান
রথে বসাইয়া তাঁরে করিব প্রস্থান।"

এই বলিয়া অরুণদেব দ্রুতপদে নিজ কার্য্যে গেলেন। তোমরা জান বোধ হয়, তিনি সূর্য্যদেবের সারথি, সমস্ত দিন তাঁর রথচালনা করেন।

উর্ব্বরাদেবী উদয়াচল হইতে নামিয়া কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন এখন কতকটা সুস্থির হইয়াছে —কুসুমিকা বেঁচে আছে আর যাঁর হাতে পড়িয়াচে সে তার কোন অনিষ্ট করে নাই ও করিবে না, একথা শুনিয়া তাঁর উন্মত্ততা কতক পরিমাণে কমিয়াছে।

এদিকে দুর্ভিক্ষে পৃথিবী ধ্বংস হয় দেখিয়া পালনকর্ত্তা বিষ্ণুদেবের মন চঞ্চল হইল। তিনি এ অমঙ্গলের কারণ সমস্ত জানিতে পারিয়া ইহার প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিলেন। উর্ব্বরা দেবী উদয়াচলের পাদদেশে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রতি দেবাদেশ হইল—

"গৃহে ফিরি যাও, দেবি, বিষ্ণুর আদেশ,
আপন কর্ত্তব্যে মন করহ নিবেশ।"

দেবী নারায়ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

এতকাল কুসুমিকা কেমন আছে, কি করিতেছে, দেখিগে। সে পাতালেশ্বরের গৃহে যাওয়া অবধি একদিনের তরেও তাঁহাকে

সুস্থির থাকিতে দেয় নাই। তমোরাবণ তাহাকে কত যত্ন করিতেন; কত মণি, মুক্তা, ও হীরার গহনা, কত খেলনা, কত বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতেন, সে সে সকল জানালা দিয়া রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলিত, আর কাঁদিয়া হাট বসাইত; কেবল বলিত—

"মার কাছে রেখে এস এখনি আমায়।"

দাসদাসীগণ কত বিবিধ প্রকারের খাদ্য ও পানীয় বস্তু আনিয়া দিত, সে সে সকল স্পর্শও করিত না। এইরূপে প্রায় ছয়মাস কাটিল। তার পর, বালিকার মন—প্রথমে তমোরাবণের প্রতি তার যে ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে প্রথমে সে যেরূপ ভয় করিত, সে ঘৃণা ও ভয় ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল; এত আদর ও ভালবাসা পাইলে কোন্ বালিকার না কমে? ইহার পর পাতালপতি কাছে আসিলে সে আর ছুটিয়া পলাইত না; তিনি আদর করিতে গেলে কাঁদিয়া হাট বসাইত না; তাঁহার কথাও দুই চারিটী কাণ পাতিয়া শুনিত। তমোরাবণ দেখিতে কুৎসিত ছিলেন না; তাঁর চোখ, মুখ, হাত, পা, গঠন—সমস্তই পরম সুন্দর, কেবল বর্ণটী কাল। কুসুমিকা আড়চোখে আড়চোখে ইহাও এখন দেখিত। যদি এখন পাতালপতি তাহার কাছে একছড়া হীরার হার রাখিয়া কহিতেন—

"কুসুমিকা, এই ছড়া পরতো গলায়,
বড়ই সুন্দর ইহা সাজিবে তোমায়।"

তাহা হইলে কুসুমিকা ঠোঁট ফুলাইয়া কহিত—

"চাইনা হীরার হার, মাথা, মুণ্ডু, ছাই ;
ছেড়ে দেও—মার কাছে দেশে চলে যাই।"

এই বলিয়া হার ছড়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইত ; জানালা দিয়া ফেলিয়া দিত না। এইরূপ ভাবগতিক দেখিয়া তমোরাবণের মনে কিছু আশা হইল, কুসুমিকা কালে তাঁহার প্রতি সদয়া হইতে পারে। কিন্তু এক বড় মুস্কিল এই যে, সে পাতালে আসিয়াছে অবধি কিছুই খায় নাই—এক ফোটা জলও না। তার ক্ষুধা হয় না, অথচ শরীর কৃশ কি দুর্ব্বলও হয় নাই। পাতালপতি একদিন অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন—

"কুসুমিকা, কোন্ বস্তু খেতে ইচ্ছা যায় ?
এখনি আনিয়া দিব—বল তা' আমায়।
ফল,মূল, বীজ, পত্র ভূবন ভিতর
যাহা চাও বল, আমি আনিব সত্বর।"

কুসুমিকা কতক্ষণ কথা কহিল না ; শেষে একবার কহিল—

"ডালিম আনিয়া দেও, তাহা হ'লে খাই"

পরক্ষণেই আবার কহিল—

"ডালিম টালিম আমি কিছুই না চাই !
মার কাছে রেখে এসো এখনি আমায়,
যা, কিছু খাইতে হয় খাইব তথায়।"

পাতালপতি শেষের কথাগুলি আর শুনেন নাই ; "ডালিম আনিয়া দেও" পর্য্যন্ত শুনিয়াই মহা উল্লাসে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দাড়িম্ব আনিবার জন্য পৃথিবীতে শত শত লোক পাঠাইলেন।

কিন্তু তখন ঘোর অনাবৃষ্টির সময়; দাড়িম্ব ফল দূরে থাকুক গাছটা পর্য্যন্ত শুকাইয়াছে। বহু অন্বেষণ করিয়া একটী লোক একখণ্ড হীরক দিয়া একটী পূর্ব্ব বৎসরের শুষ্ক ডালিম আনিল। পাতালপতির একজন পরিচারিকা উহা একখানি সোণার থালে করিয়া কুসুমিকাকে খাইতে দিল। বালিকা বহুদিন পরে তাহার প্রিয় ফল ডালিম পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইল, তাহার নির্ব্বাপিত ক্ষুধানলও জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে খাইবে কি না ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কেন না, সে তাহার মায়ের কাছে শুনিয়াছিল, পাতালে যাইয়া কেহ যদি কিছু খায় তবে আর তথা হইতে সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সে কয়েকটী দানা লইয়া একবার উহা মুখের কাছে লইতেছে, একবার উহা থালার উপর রাখিতেছে —লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। অবশেষে যেন আপনার অজ্ঞাতেই দানা কয়েকটী মুখে ফেলিয়া দিল; তখনও গলাধঃকরণ হয় নাই, এমন সময় তমোরাবণকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণু দূত গরুড় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কুসুমিকা তাড়াতাড়ি মুখের দানাগুলি থুথু করিয়া ফেলিয়া দিল—ফলের রস কিছু পেটে গিয়াছিল। গরুড় কহিলেন—

"কুসুমিকা, মা তোমার বিরহে তোমার
ভ্রমিছে উন্মত্তপ্রায় সমস্ত সংসার।
তাঁহার অযত্নে শস্য ফলে না ধরায়,
দুর্ভিক্ষে ব্রহ্মার সৃষ্টি বুঝি লোপ পায়।

এখনি আমার সঙ্গে কর আগমন,
জননীর কোলে তোমা' করিব স্থাপন।"

শুনিয়া বালিকা মহা আহ্লাদে এক লাফে আসিয়া গরুড়ের গলা জড়াইয়া ধরিল ও অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। আনন্দের আবেগ একটু কমিলে সে তমোরাবণের দিকে একটু আড় চোখে চাহিল—পাতালপতি এক পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন—
চক্ষে জল টস্ টস্ করিতেছে, মনে মনে কহিতেছেন—

"এত যে বাসিনু ভাল—করিনু যতন,
তথাপি আমাতে এর কিছু নাহি মন।"

আমি গ্রন্থকার বলি—"তমোরাবণ মহাশয়, দুঃখিত হইবেন না—চোখের জল মুছুন; আপনি তো আপনি, এখনও কুসুমিকার স্বামী নন, আপনাকে ছাড়িয়া মায়ের কাছে যাইতে বালিকা যে কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিবে এতে আর বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আর বালিকার কথাই বা কেন বলি? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বহু বালক বালিকার মাতা হইয়াও স্ত্রীলোকেরা বাপের বাড়ী যাইবার জন্য পাগল হইয়া থাকে—তাহাদের স্বভাবই এই। তখন স্বামী, পুত্র, সংসার গৃহস্থালি কিছু মানে না,—দৃক্‌পাতও করে না। আপনি দুঃখিত হইবেন না।"

তবু যাহোক, কুসুমিকা তমোরাবণের প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল—

"এখন মাতার কাছে যাই একবার—
দুঃখিত হয়োনা, দেখা হইবে আবার ;—

অথবা এসোনা কেন আমাদের সনে ?
মাতার সহিত সুখে রহিব দু'জনে।
আমাদের ধরাধাম সুখের আগার,
তোমার রাজ্যের মত নহে অন্ধকার ;
সেখানে সোণার সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণ
অকাতরে করে কত আলো বিতরণ।
কত ফল, শস্য হয়, কত ফোটে ফুল,
তোমার হীরক তায় নহে সমতুল।
চল—কথা শুন—এস ধরাধামে যাই—
কি ক'রে যে থাক হেথা ভাবিয়া না পাই !"

কিন্তু তাও কি হয় ? পাতালপতি পাতালেই রহিলেন ; কুসুমিকা গরুড়ের সহিত পৃথিবীতে গেলেন। আশ্চর্য্যের কথা শুন, তিনি পৃথিবীতে পা দিবামাত্র—

শুষ্ক তরু সঞ্জীবিত হয় পুনরায়,
ফুলে ফলে সুশোভিত শাখায় শাখায় ;
যত যত ক্ষেত্র ছিল মরুর আকার
বহিতে শস্যের ভার পারে নাকো আর ;
জাগিয়া রজনী শেষে কৃষক সকল
এ আশ্চর্য্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল।
স্বচ্ছন্দ নবীন তৃণ শোভিছে ভূতলে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে পশুগণ মাঠ পানে চলে।

শাখে শাখে পক্ষীকুল করে কোলাহল,
আনন্দে ধরিত্রী যেন হইল পাগল।

যথাসময়ে কুসুমিকা মায়ের নিকট পৌঁছিল ; তখন তাহাদের মনে যে আনন্দ হইল, আমি তাহা বর্ণন করিব না,— পারিলে তো ?

কিন্তু এক কথা ; বিদায় হইবার সময় গরুড় ঊর্ব্বরা দেবীকে কহিয়া গেলেন—

"পাতাল পুরেতে, দেবি, তনয়া তোমার,
ছয়টী দাড়িম্ব দানা করেছে আহার ;
সেই হেতু প্রতি বর্ষে ছয় ছয় মাস
করিতে হইবে তার পাতালেতে বাস।"

এই কথা শুনিয়া কুসুমিকা লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে মাতাকে কহিল—"দেখ মা, অনেক কাল অনাহারের পর প্রিয় ডালিম পাইয়া আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলাম না। তা' যা' হোক্, পাতাল জায়গাটা বড় ভাল নয় বটে, কিন্তু সে পাতালপতি নিজে লোকটী মন্দ নন ;—আমাকে বড় আদর যত্ন করেছেন।

তা' না হয় তাঁর কাছে রব ছয় মাস,
ছয় মাস করিব তোমার সহ বাস।"

ঊর্ব্বরা দেবী হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, করিও"।

স্বর্ণপরশ বণিক।

সর্ব্বশেষে একটী ছোট গল্প বলিয়া তোমাদের কাছে বিদায় লইব। পাঠকপাঠিকাগণ, আমার বিদায়ে তোমরা কি দুঃখিত হইবে, না হাঁপ ছাড়িয়া বলিবে, "যাক্, আপদ গেল ?"

দেখ, প্রাচীন কালে সুবর্ণরেখা নদীতীরে এক গ্রাম ছিল. তথায় রত্নপাল নামে এক বণিক বাস করিতেন। তাঁহার একটী দশ বার বৎসরের মেয়ে ; তার নাম ললিতা। রত্নপাল অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। অত্যন্ত ধনী লোকেরা প্রায়শঃ অত্যন্ত কৃপণ হইয়া থাকে ; রত্নপালও তাহাই হইয়াছিলেন। তাঁর ধনের পিপাসা কিছুতেই মিটিত না। তিনি স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে ভাল বাসিতেন না, স্বর্ণমুদ্রা গুলির ঝন্‌ঝনাৎকার শব্দ ব্যতীত আর কিছু শুনিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কন্যা ললিতাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। সংসারে দুইটী মাত্র জিনিসে তাঁহার মমতা ছিল ; প্রথম স্বর্ণ, পরে কন্যা। তাঁর শয়নগৃহের নীচে এক অতি প্রশস্ত অন্ধকার কক্ষ ছিল। তাহার লোহার কপাট ও লোহার জানালা। সেই কক্ষে তিনি

স্তূপে স্তূপে তাঁহার স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণের বাসনপত্র ও অন্যান্য বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন। আহার নিদ্রার সময় ব্যতীত তিনি প্রায় সর্ব্বদাই সেই কক্ষমধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনো মুদ্রাগুলি, কখনো বাসনপত্রগুলি, কখনো বা আর আর সম্পত্তি গুলি গণিতেন ও নাড়িতেন চাড়িতেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত সুখ হইত; আবার দুঃখও হইত। ভাবিতেন—

একটী একটী করি সংগ্রহ করিয়া
এইমাত্র লভিয়াছি জীবন ভরিয়া
আহাহা! এমন ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবন,
এক জীবনেতে আর কত হ'বে ধন?
লক্ষ বর্ষ পরমায়ু আমাদের হয়,
ধন সংগ্রহের তবে কিঞ্চিৎ সময়;
অথবা পরশমণি কোনখানে পাই
স্বর্ণের পিপাসা আমি তা'হলে মিটাই!

একদিন বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে, একটী দিব্য সুন্দর পুরুষ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। রত্নপাল প্রথমে অত্যন্ত ভীত পরে অত্যন্ত বিস্মিত ও কুপিত হইলেন—

"কে তুমি? কে তুমি এলে কক্ষের ভিতর?
চোর বুঝি?—দস্যু বুঝি?—দাঁড়াও, পামর!"

এই বলিয়া তিনি তরবার খুলিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখনি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, আগন্তুকের চোর কিম্বা দস্যুর

লক্ষণ কিছুই নাই ; দিব্য শান্ত পুরুষটী, অল্প অল্প হাসিতেছেন। বিশেষ, কক্ষের দরজা যেমন বন্ধ তেমনই রহিয়াছে, মানুষ প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া ? রত্নপাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আগন্তুক কহিলেন—

"চোর কিম্বা দস্যু আমি নহি, মহাশয়,
বৃথা ক্রোধ করিতেছ, বৃথা তব ভয়।"

বণিক লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তুমি কে ? কি জন্য আসিয়াছ ? আর কিরূপেই বা এ গৃহে প্রবেশ করিলে ?"

আগন্তুক কহিলেন—

"যে হই সে হই আমি, যেমনেই হয়
প্রবেশ করেছি কক্ষে—সে কথা নিশ্চয় ;
কক্ষতল কিম্বা ছাদ কিম্বা হ'তে পারে—
দেয়াল ভেদিয়া আমি আসিয়াছি ঘরে।
বোধ হয় যাদু জানি কিম্বা দৈববলে
যেখানে সেখানে মম গতিবিধি চলে।
রত্নপাল, দেখিতেছি এখনও তোমার
বলবতী ধনতৃষ্ণা হয়নি নিবার'।"

রত্নপাল কহিলেন—

"কেমনে হইবে ? দেখ সমস্ত জীবন
এত শ্রম, এত চেষ্টা, এমন যতন—
প্রাণান্ত আয়াস করি এই মাত্র লাভ
এই এক মুষ্টি ধন—হায় মনস্তাপ !

ইচ্ছা করে বক্ষ হতে মাংস করি দান
কেহ যদি স্বর্ণ দেয় সম পরিমাণ!
হায়রে, সুবর্ণ! হায়, আরাধ্য আমার!
এ জীবনে আশাপূর্ণ হবে নাকি আর?

তাহা শুনিয়া আগন্তুক মৃদু মৃদু হাসিলেন; কহিলেন—

"এত ধনে প্রয়োজন কি বল তোমার,
এত যে রয়েছে, আশা মিটে নাকি আর?
পর্ব্বত করেছ, বাছা, স্বর্ণরত্নধনে
ভুঞ্জিলে না কোন সুখ আপন জীবনে;
চিন্তায় শরীর ক্ষয় করিছ কেবল
পাছে কেহ নিয়ে যায় সম্পদ সকল।
জীবনের শেষে এবে আসিয়াছ প্রায়,
ভোগের সময় দেখি ফুরায় ফুরায়
সঙ্গে কিছু নিবে কি হে বৈতরণী পারে?
সে কথাটী, রত্নপাল, কহতো আমারে।
একটী সন্তান মাত্র ললিতা তোমার,
দু'হাতে ছড়ালে ধন ফুরাবে না তার।
রত্নপাল, স্বর্ণে আর নাহি প্রয়োজন,
ব্যাকুলতা পরিহরি শান্ত কর মন।"

রত্নপাল ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—

"কি বল, নির্ব্বোধ, ধনে নাহি প্রয়োজন,
কি কারণে তবে আর বহিব জীবন?

জানিনা কিছুই আর স্বর্ণরত্ন বই
শ্মশানে যেতেও পথে পাই যদি লই!
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, পরমার্থ ধন,
হে স্বুরর্ণ, তুমি সত্য, তুমি সনাতন!
তোমার পূজায় ভবে জীবন কাটাই
অন্তিমে তোমারি দেহে মিশে যেন যাই!"

আগন্তুক আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি কহিলেন—"শুন, রত্নপাল, আমি যদি দেবতা হই, আর তোমাকে অভিলষিত বর দিতে আসিয়া থাকি, তবে তুমি কি বর প্রার্থনা কর? রত্নপাল অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আগন্তুকের মুখ পানে তাকাইলেন; তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও আশায় উথলিয়া উঠিল; কেমনা, তাঁহারো মনে কতকটা এইরূপ ভাবেরই উদয় হইতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি ইনি দেবতাই না হবেন তবে এ গৃহে প্রবেশ করিলেন কিরূপে? আর দেবতাই যদি হন তবে আমাকে বর দিবার অভিপ্রায় না থাকিলে কেন আসিবেন? ইনি নিশ্চয় দেবকোষাধ্যক্ষ কুবের; আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঈপ্সিত বর প্রদান করিতে আসিয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা করিলেন; পরে তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল; তিনি কহিলেন—

হে দেব, কুবের তুমি এই মনে লয়,
প্রসন্ন এ অকিঞ্চনে হয়েছ নিশ্চয়।

এই বর দেহ মোরে—বর(ই) যদি দিবে—
যাহা পরশিব তাই সুবর্ণ হইবে !

আগন্তুক কহিলেন—

"এ বরে কামনা তব হবে তো পূরণ ?
ভাল ক'রে বুঝে সুঝে করো আকিঞ্চন ;
আমাকে দূষো না যেন শেষে, মহাশয়,
"ছেড়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি" সে দশা না হয় !"

রত্নপাল আগ্রহের সহিত কহিলেন—

"ভাল ক'রে বুঝিয়াছি, মনে নাহি আন—
আমাকে এ বর, দেব, করুণ প্রদান ;
পায়ে পড়ি, এই(ই) বর—অন্য বর নয়—
আমার পরশে স্বর্ণ হ'বে সমুদয়।
আহারে ! আহারে ! কিবা সুখ-পারাবার—
জীবন্ত পরশমণি হইব এবার !"

তখন আগন্তুক কহিলেন—"তথাস্তু ; আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইতে তোমার স্পর্শে সমস্ত বস্তুই সুবর্ণ হইবে।" এই বলিয়া তিনি কখন কোন্ পথে অন্তর্হিত হইলেন, রত্নপাল তাহা জানেন না ; তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন।

যে ভাবে তাঁর সে রাত্রি প্রভাত হইল তাহা তিনিই জানেন। আহার নিদ্রা তো দূরের কথা, সন্ধ্যার পরক্ষণ হইতেই রাত্রি কেন প্রভাত হয় না এই ক্ষোভে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার মত হইল। যাহা হোক্, দিনরাত্রি কাহারো

সুখের খাতিরেও বসিয়া থাকে না, দুঃখের খাতিরেও নয়। সে রাত্রিও যথা সময়ে প্রভাত হইল। পূর্ব্বাকাশে একটু আলো দেখা দিবামাত্রই রত্নপাল গৃহস্থিত এটা, ওটা, সেটা ছুঁইতে লাগিলেন। কিন্তু কোনটাই তো সোণা হইল না! যা! তবে কি দেবতা ছলনা করিলেন? রত্নপালের বুক যেন নিরাশা ও দুঃখে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল। তিনি একখানি কাষ্ঠাসনের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। রত্নপাল বিহ্বলের মত চাহিয়া দেখেন, তিনি একখানি সোণার আসনে পড়িয়া আছেন। তখন সহসা সব কথা মনে পড়িল; তাঁহার পরশে কাঠের আসন সোণার আসন হইয়াছে, বুঝিলেন। ইহাও বুঝিলেন যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বর ফলে নাই—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়াছে। রত্নপালের মনে যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণন করে কার সাধ্য? তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে এটা, ওটা, সেটা—গৃহের মধ্যে যত দ্রব্য ছিল সব গুলি হাতে, পায়ে, নাকে, মুখে স্পর্শ করিতে লাগিলেন, সবগুলি তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হইয়া গেল! তিনি যে কাপড় পরিয়াছিলেন তাহাও সোণার সূতার কাপড় হইয়াছিল—এতক্ষণ নজর করেন নাই, এখন দেখিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে, দেখিলেন; দেখিয়া মনে করিলেন ঐ ফুলগুলিকে সোণার ফুল করিব। তৎক্ষণাৎ বাগানের দিকে ছুটিয়া গেলেন। যাইতে যেখানে যেখানে পা ফেলেন,

সেখানকার ইট, পাথর, মাটি, কাঠ—সব সোণা হইয়া যায়। রত্নপালের মনে ভাবনা হইল, এত সোণা রাখি কোথায়? এত সোণা লুকাব কি প্রকারে? এত বেশী বেশী সোণা হইলে সকলেই লইয়া যাইবে, আমি কেমন করিয়া বারণ করিব? আমিই আর তাহা হইলে একমাত্র ধনী রহিব না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাগানে প্রবেশ করিয়া অন্যমনস্কভাবে কতগুলি ফুল ছুঁইলেন—সবগুলি সোণার ফুল হইয়া সূর্য্য-কিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তাহাদের আর সৌরভ রহিল না।

রত্নপালের মনে ভাবনা প্রবেশ করিয়াছে। হায়রে! নিরবিচ্ছিন্ন সুখ কিছুতেই নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—আমার স্পর্শে সমস্ত দ্রব্য সোণা হয়, একথা তো আজই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন লোকে আমাকে যদি মায়াবী কি অপদেবতা বলিয়া মারিয়া ফেলে? মনে মনে স্থির করিলেন—ঘর হইতে বাহির হইব না; আর বেশী কিছু স্পর্শ করিব না। এই সঙ্কল্প করিয়া গৃহমধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। আহারের বেলা হইলে কন্যা ললিতাকে ডাকিয়া কহিলেন—"মা ললিতা, ভৃত্যগণের আসিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার অন্নব্যঞ্জন লইয়া আইস।" ললিতা পিত্তলের থালা ও বাটীতে অন্নব্যঞ্জন আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল, কোন দিকে বড় দৃষ্টি করিল না। রত্নপালের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল, তিনি আহারে বসিলেন। থালাখানি সম্মুখে টানিয়া লইতে পিত্তলের থালা স্বর্ণ হইল; হউক, ক্ষতি নাই। ভাতে হাত দিতেই ভাত—হরিহে!—ভাত তো আর

ভাত রহিল না, সব সোণার দানা হইয়া গেল! সোণার দানা কি খাওয়া যায়? রত্নপাল হতভম্বের ন্যায় হইলেন। একবার মনে করিলেন—আচ্ছা দেখি, হঠাৎ মুখে ফেলিয়া দিলে খাওয়া যায় কি না; এই মনে করিয়া ভাতের থালা সরাইয়া রাখিয়া একটা বাটিতে পায়স ছিল, বাটিটা কিনারায় ধরিলেন—পায়স ছুঁইলেন না—এবং হাঁ করিয়া বাটি উপুড় করিয়া পায়সগুলি মুখে ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু হায়, সে আশাতেও ছাই! চাল ও দুধের পায়স মুখে পড়িবামাত্র সোণার দানা ও তরল সোনা হইয়া গেল। পায়স গরম ছিল, রত্নপালের জিহ্বা ও তালু পুড়িয়া গেল। তিনি থু থু করিয়া মুখের সোণা ফেলিয়া দিয়া জলপাত্র মুখে তুলিলেন, জল তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্র তরল স্বর্ণে পরিবর্ত্তির হইল। বৃদ্ধ রত্নপালের আর সহ্য হইল না—তিনি "হায়! হায়!" করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তাঁহার কাতর চীৎকার শুনিয়া তাঁহার কন্যা ললিতা দৌড়িয়া আসিল এবং "বাবা, কি হইয়াছে? কান্দিতেছ কেন?" বলিতে বলিতে তাঁহাকে সাপটিয়া ধরিল আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্ত-মাংসের দেহ যাইয়া সোণার দেহ হইল—জীবন আর রহিল না—হায়! হায়! কি হইল!

তখন রত্নপাল শোকে পাগল হইলেন। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং বুকে করাঘাত করিতে করিতে ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন, তাহাতে ঘরের মেঝেটা সোণায় বান্ধা হইয়া গেল। রত্নপাল আকুল হইয়া কান্দিতেছেন, কখনো

শোকে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আবার আপনা আপনিই চৈতন্য হইতেছে। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, যিনি তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, তিনি গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে তাঁহাকে দেখিতেছেন। রত্নপাল কোন প্রকারে উঠিয়া গিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন; ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—

"ফিরে নেও বর, দেব, বাঁচাও বাঁচাও,
আমার কন্যাকে, দেব, প্রাণ ফিরে দাও।
চাইনা সুবর্ণ—ধনে প্রয়োজন নাই;
দূর করে ফেলে দাও হীরা, মণি, ছাই!
বর ফিরে নাও, দয়া কর, দয়াময়,
আমার পরশে স্বর্ণ আর নাহি হয়।
হায়! হায়! কি হলো রে! কি করি উপায়,
ললিতাকে রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়!"

আগন্তুক ধীরগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—

"এতক্ষণে হইয়াছে জ্ঞানের সঞ্চার,
এতক্ষণে ধনতৃষ্ণা মিটেছে তোমার।
ভাল, রত্নপাল, তুমি বুঝেছ কি এবে
বড় বেশী কোন কিছু ভাল নয় ভবে?

বণিক আগ্রহের সহিত কহিলেন—

"বুঝেছি, বুঝেছি, দেব, বুঝেছি এখন;
ধনতৃষ্ণা মিটিয়াছে জন্মের মতন।

ললিতাকে রক্ষা কর ফিরে নেও বর,
করুণা কটাক্ষ কর বৃদ্ধের উপর।

তখন আগন্তুক রত্নপালকে এক কমণ্ডলু জল দিয়া কহিলেন—

"কন্যার শরীরে ইহা করহ সিঞ্চন
যেমন আছিল দেহ হইবে তেমন ;
স্বর্ণ করিয়াছ যত দেখ সমুদায়
এই জলে পূর্ব্বমূর্ত্তি পাবে পুনরায়।

রত্নপাল আগ্রহের সহিত তাঁহার হস্ত হইতে কমণ্ডলু লইয়া প্রায় সমস্ত জলটাই ললিতার মাথায় ঢালিয়া দিলেন। ললিতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিল, "বাবা, বাবা, কর কি ? আমার যে সর্দ্দি হবে!" মুহূর্ত্ত মধ্যে ললিতা পূর্ব্বদেহ ও জীবন পাইয়াছিল, সে যে সুবর্ণপ্রতিমা হইয়াছিল, তাহা সে জানিতও না। অনন্তর রত্নপাল অবশিষ্ট জল দ্বারায় গৃহের কতককতক বস্তু ও বাগানের কতক কতক ফুল পূর্ব্বাবস্থায় আনিলেন ; শেষে জল আর নাই। হাজার হাজার মণ সুবর্ণ রহিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে সুবর্ণরেখা নদীতে বৃদ্ধ বণিকের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেখ, কতকাল গিয়াছে, এখনো ঐ নদীর বালুতে সোণা পাওয়া যায়।